গুদোমে গুমখুন

গুদোমে গুমখুন

সঞ্জীব চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যম্ । ১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশক : ১৯৫৯

প্রকাশক :
সাহিত্যম্
নির্মলকুমার সাহা
১৮বি, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রাপ্তিস্থান :
নির্মল বুক এজেন্সী
৮৯ মহাত্মা গান্ধী রোড
কলিকাতা-৭০০ ০০৭

নির্মল পুস্তকালয়
১৮বি শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা - ৭০০ ০৭৩

প্রচ্ছদ : প্রণবেশ মাইতি

মুদ্রক :
লোকনাথ বাইণ্ডিং অ্যাণ্ড প্রিন্টিং ওয়ার্কাস
২৪বি, কলেজ রো
কলিকাতা - ৭০০ ০০৯

পাল্লার একদিকে সুখ আর একদিকে দুঃখ। দুঃখের দিকটাই ঝুলে আছে। সুখ যে একেবারেই নেই, বলি কী করে! বেঁচে তো আছি, মরে তো যাইনি। দু-বেলা দু-মুঠো জুটছে। মাথার উপরে ছাত আছে। চেয়ার আছে, টেবিল আছে। বিছানা আছে। তবে চাদরটা সরাবেন না। তোশকে একটা-দুটো খাবলা দেখতে পাবেন। তুলোর ডেলা দাঁত বের করে আছে। তা হবে না। ফার্টি ইয়ারস ফেইথফুল সার্ভিস দিয়ে আসছে। আমার বউয়ের সঙ্গে শ্বশুর বাড়ি থেকে এসেছিল। আমার বউ আমার সঙ্গে গাঁটছড়া বাঁধা হয়ে এসেছিল আগে। একদিন পরে একটা লরি চেপে এসেছিল যাবতীয় ফাউ। বউয়ের ফাউ সাধারণত যা আসে। চাইলেও আসে, না চাইলেও আসে। একটা খাটের বিচ্ছিন্ন অঙ্গপ্রতঙ্গ। ফুলশয্যার খাট খোলা অবস্থাতেই আসে। মাথার দিকে, পায়ের দিক, দুটো সাইড, দু-পিস চালি, আটখণ্ডে ছতরি। পরে ফিট করে নিতে হয়। একমাত্র মড়ার খাটই ফিট হয়ে আসে। এইসব জানা কথা আর জানিয়ে লাভ নেই। অবান্তর সেন্টিমেন্ট। চল্লিশ বছর আগে বয়েস যখন পঁচিশ, কে আর ভেবেছিল মরতে হবে। খাটের সঙ্গে ড্রেসিং টেবল এসেছিল, একটা লোহার আলমারি, তাগড়া একটা ছোবড়ার গদি, লেপ, তোশক, বালিশ। মনে আছে, সাইলেনসার ফাটা লরিটা যখন বিকট শব্দ করে আসছিল আমি তখন নতুন ধুতি, কোরা গেঞ্জি পরে দোতলার বারান্দায় দাঁড়িয়েছিলুম। ঢ্যাঙা আলমারিটা দুলছিল বিজ্ঞের মতো। যেন কথা বলছিল, হুঁহুঁ বাব্বা, আমি আসছি। খাঁজে খাঁজে, ভাঁজে ভাঁজে, পাটে পাটে ভরবে জীবনের আবর্জনা। ধুতি, শাড়ি, জামা, প্যান্ট, শাল, সোয়েটার, কার্ডিগান। লকারে কিছু গয়না। নগদ দু-একশো, ইনশিয়োরেনসের পলিসি, বার্থ সার্টিফিকেট। পাল্লাটা যতবার খুলবে, ধড়াস শব্দ। জীবনের ওইটাই জাতীয় সংগীত। বেশ আছো। বেশ আছো, হঠাৎ ধড়াশ শ্বশুরমশাই একটা ইজি চেয়ারও দিয়েছিলেন। কেন তা জানি না। হয়তো ওই ত্রিভঙ্গের ভাষায় বলতে চেয়েছিলেন, বাবাজীবন, টেক ইট ইজি। সারাজীবন একটি বুটিদার এঁচোড়কেই তো আলিঙ্গন করতে হবে। সারাফেসটা রাফ। আঠা আছে। তেল মেখে ছাড়াতে হবে। তেল হল, ধৈর্য, সহনশীলতা। আর মেজাজের গরম মশলা দিয়ে ভালো করে কষতে পারলে দেশ সুস্বাদু। বাবাজীবন, টেক ইট ইজি। ছোবল মারবে, তবে মরবে না, নেশা হবে। তখন এই ত্রিভঙ্গে দেহভার এলিয়ে দিয়েও আরাম পাবে।

সেই সব জিনিস চল্লিশ বছর ধরে রয়েছে। এখন অবশ্য দাঁত বের করে আছে। প্রাচীন হয়েছে তো। রঙ, পালিশ চটে গেছে। ড্রেসিং টেবলের আয়নায় মুখ সুপার ইম্পোজ করলে মনে হয় পক্স হয়েছিল। কালো কালো দাগ। দিশি কাচের শেষ অবস্থাটা এইরকমই। তবে আয়না জিনসটা খুব সহজ নয়। ঘোর দার্শনিক। আত্মদর্শন করায়। মানুষ সব দেখতে পায় না। নিজের মুখ দেখতে পায় না। আয়না দেখায়। যুবকের পালিশ করা মুখ, প্রৌঢ়ের তোবড়া মুখ, বৃদ্ধের বিদায়ী মুখ। শেষ অবস্থায় ফেড আউট। আয়না আর কিছু দেখাবে না, প্রয়োজন নেই। তুমিও যাচ্ছ, আয়নাও যাচ্ছে।

চল্লিশ বছর আগে এইসব ভাবিনি। পঁচিশে পঁয়ষট্টির ভাবনা আসবে কেন। তখন তো মোড়কখোলা যৌবন। তাজা চানাচুরের মতো মুচমুচে। বেঁচে থাকার ড্যাম্প লাগেনি। বন্ধুকে-বন্ধু মনে হয়, প্রতিবেশীকে আত্মীয়। মানুষকে মানুষ মনে হয়। বাঘ, সাপ, শেয়াল, ছুঁচো, বাইসন, বিছে মনে হতো না। ঝকঝকে দেওয়াল, ঝলমলে আলো, টলটলে বউ। সে আবার প্রেম করে বিয়ে। কেলেঙ্কারি কাণ্ড বইকী। চল্লিশ বছর আগে উপন্যাসের পাতা ছিঁড়ে সিনেমার পর্দা ফুঁড়ে অনুশাসনের বাঁধ ভেঙে প্রেমের জোয়ার আসেনি। ব্যাভিচার ছিল, প্রেম উঁকি মারছিল, তবে বিয়ে হতো না। অবিভাবকদের এক থাপ্পড়ে প্রেম চটকে যেত। বেশির ভাগ ঘায়েল হতো মেয়েরা। তাদের সরিয়ে নেওয়া হতো। গৃহবন্দি, নজরবন্দি। তাড়াতাড়ি ছেলে দেখে বিয়ে দেওয়া হতো। প্রেমের মতো পাপ আর নেই। প্রেম করে বিয়ে? মামার বাড়ি? আমরা তোমার বিয়ে দেব, দেখে শুনে সম্বন্ধ করে। ছেলে দেখব, ঘর দেখব, পেশা দেখব। বিয়ের পর মশারির ভেতর যত পার প্রেম করো, রাত এগারোটার পরে, গুরুজনরা শুয়ে পড়লে, তার আগে কখনই নয়। প্রেমের কথা বলবে ফিসফিস করে। কেউ যেন না শুনতে পায়। আই লাভ ইউ বলে ধিতিং ধিতিং নেচো না। ললেস লাভার হলে ঠাণ্ডা করে দেব। মানে সাইলেনসার লাগান রিভলভার। মাঝরাতে স্বামী-স্ত্রী প্রেমের কথা বলবে চুপি চুপি। মোড়ের মাথার মাঝরাতের উন্মাদ কুকুরের মতো চিৎকার ছেড়ো না।

আমার প্রেম ফুল প্রেম ছিল বললে বাড়াবাড়ি হয়ে যায়। হাফ প্রেম। প্রেমের মতো। বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে যাইনি, ইলোপ করিনি প্রেমিকাকে। পেটানিও খাইনি। কোনো র‍্যাইভ্যালও ছিল না। আমাদের পাড়ারই মেয়ে। আমাদের বাড়িতে আসা-যাওয়া ছিল। আমার বাবাকে কাকাবাবু বলত। ইংরেজি, অঙ্ক আটকে গেল আমার পণ্ডিত পিতার কাছে তালিম নিত। আমাদের বাড়িতে তার খুব সুখ্যাতি ছিল। আমি কতটা গবেট বোঝাবার জন্যে তার উপমা টানা-হত। ইনটেলিজেন্ট, ভেরি শার্প। চোখা মেয়ে। এমন কথাও শুনতে হত, লেখাপড়ায় ও একদিন তোমার কান কেটে ছেড়ে দেবে। তারপরে একটা উপসংহার হতো,

হবে না কেন! মেয়েদেরই তো যুগ আসছে, গান-বাজনা-নাচ-ছবি আঁকা-লেখাপড়া, সব একসঙ্গে সামলাতে পারে মেয়েরা। ডিভোশন আছে, সিনসিয়ার, সিরিয়াস। কমপিটিটিভ পরীক্ষায় মেয়েরা মাস্টার্স ডিগ্রিতে মেয়েরা ফার্স্ট। তোমরা শুধু ইস্টবেঙ্গল, মোহনবাগান করে যাও। লজ্জা হওয়া উচিত। পায়ের ধুলো নাও। প্রার্থনা করো, মানুষের মতো একটু বুদ্ধি দাও মা। এ লজ্জা রাখি কোথায়, বোভাইন ব্রেন ইন এ হিউম্যান ক্রোনিয়াম।

হিংসে হতো, রাগ হতো। এত সুখ্যাতি কিসের। বাবার সামনে টেবিলে বসে মাথা নিচু করে অঙ্ক কষছে এক মনে। ঘাড়ের কাছে এলো খোঁপা। বিপরীত দিকের জানালা দিয়ে আলো এসে পড়েছে। চুলে। চকচক করছে। ঢালু কপাল। বড়ো বড়ো চোখের পাতা। ধারালো মুখ। মেলায়েম রং-এর শাড়ি। গোল গোল হাত। অঙ্ক না পারি ভালোবাসতে তো পারি।

প্রেমে পড়ে গেলুম। একতরফা প্রেম। পেছন থেকে দেখি, পাশ থেকে দেখি। মুখে কিছু বলি না। প্রেমকে স্পর্শ করতে হয়। খুব সাবধানে এগোতে হয়, ছোট্ট, নিরীহ, কালো পিঁপড়ের মতো। হাত বেয়ে, পা বেয়ে, ঘাড় বেয়ে উঠতে হয়। ডুমো মাছির মতো ভ্যানভ্যান করলে হয় না। বাবা হয়তো উঠে গেছেন, কী সেইদিনের মতো অফিসে চলে গেছেন, সে বসে বসে পড়ছে, আমি তখন খুব সেবা করার চেষ্টা করতুম। জল এনে দিচ্ছি, পেনসিলের শিস বেড়ে দিচ্ছি, গরম তেলেভাজা এনে খাওয়াচ্ছি। আপত্তি করত না। সেবা নিত। তার মানে, ওষুধ ধরেছে। প্রেমেও অ্যালোপ্যাথি, হোমিয়োপ্যাথি আছে। ধাত বুঝে। যদি বেড়ে যায়, মানে রেগে যায়, তার অর্থ এই নয় যে ফেঁসে গেল। হোমিয়োতে প্রথমে বাড়ে তার পরে কমে।

নির্লজ্জ না হলে প্রেম হয় না। মান-সম্মান বোধ নিয়ে অফিসের বড়ো কর্তা হওয়া যায়, প্রেমিক হওয়া যায় না। চোরের মতো দুর্বল জায়গায় রাতের অন্ধকারে সিঁদ কেটে প্রথমে মাথাটা গলাতে হয়। ছেলেগিরি না ফলিয়ে আমি দাসভাবে তার উপাসনা করেছিলুম। ম্যায় গুলাম, ম্যায় গুলাম। অতবড়ো একটা শিবঠাকুর, যাঁর পাওয়ারের কোনো সীমা ছিল না, রেগে গেলে নাটরাজ, দক্ষের যজ্ঞ, দক্ষযজ্ঞ করে দিলেন যিনি, যাঁর দলে নন্দী-ভৃঙ্গী, হাতে ত্রিশুল, গলায় বিষধরের লকেট, তিনি হয়ে গেলেন চিৎ, বুকের পাটায় মা কালী। পদতলে পড়ে ভোলা। এই হল সারেন্ডার। মেয়েদের পায়ে পড়তে হয়। আমাদের বাড়িতে সেকালে কাপড় বিক্রি করতে আসত ফিরিঅলা। পিঠে কাপড়ের বোঝা। সামনে একটু ঝুঁকে আছে। হাতে এটা লোহার সরু ডান্ডা। সেটা হল গজকাঠি। নিঃশব্দে চোরের মতো কুঁজো হয়ে ঢুকল। সেই যে ঢুকল বেরোবার আর নাম নেই। নিস্তব্ধ দুপুর। ঘুঘুর বিশ্রম্ভালাপ। কর্তারা কাছারিতে। ঠান্ডা লাল মেঝেতে ছত্রাকার শাড়ি। মেয়েরা ঘিরে বসে আছে। রঙের বাহার চিত্তজয়।

মেয়েদের অন্তরে সিঁদিয়ে গেছে শাড়িঅলা। প্রেমের ফিরিঅলাকেও এই কায়দাতেই ঢুকতে হয়। দুর্গজয় বরং সহজ মেয়েদের মন জয়ের চেয়ে।

আমার ফ্রেন্ড কৈলাস বলেছিল, বর্ষাকালে ময়ূর দেখেছিস? আমি দেখেছি শান্তিনিকেতনে। সবুজে সবুজ। সাদা ফুল, হলুদ ফুল, মাধবী, কুন্দ, গুলঞ্চ, বকুল। ময়ূর হঠাৎ পেখম খুলল। আহা! সে কী দৃশ্য রে ভাই। অবিশ্বাস্য সুন্দর। ময়ূরকণ্ঠী রঙের শিহরণ। গায়ে কাঁটা দেয়। ময়ূর নাচছে। ঘুরে ঘুরে। নেচেই চলেছে খড়খড়ে পায়ে। শুধুমাত্র একটি ময়ূরীর জন্যে। ধৈর্য চাই, নিষ্ঠা চাই, সাধনা চাই। ধর তক্তা মার পেরেক নয়। চা তৈরির কায়দা। একফুটের জলে, দু-চামচে দার্জিলিং, ঢাকা। ঘড়ি ধরে পাঁচমিনিট ধ্যান। কাপে ঢালো। সোনালি তরল, ভুরভুরে গন্ধ, পরিমাণ মতো দুধ, চিনি। এর নাম প্রেম। রুটি সেঁকা দেখেছিস! চাটু থেকে উনুনে। ফোঁস করে ফুলল। এই ফোলাটা প্রেম। বেশিক্ষণ থাকবে না ফোলাটা থেবড়ে যাবে। এই থেবড়ানো অবস্থাটা হল দাম্পত্য জীবন। ওপর নিচ এক। বুকে পিঠে সেঁটে গেল। এই হল থিয়োরি। এইবার প্র্যাকটিস।

প্রেমের সঙ্গে গান আসে। যেমন সর্দির সঙ্গে জ্বর। সেই সময়কার হিট গান—শোনো, শোনো কথাটি শোনো অভিমানে যেও না চলে। তোলো, তোলো, ও মুখ তোলো কেন লাজে নীরব হলে। আর একটা ছিল, মোর প্রিয়া হবে এসো রানি, দেব খোঁপায় তারার ফুল। সারাদিন এইসব গান হুঁ হুঁ, হুঁ হুঁ করতুম। সবুজ আরো সবুজ, নীল আরো নীল। প্রেমযমুনায় হয়তো বা কেউ ঢেউ দিল রে। রাতে বিছানায় শুয়ে মনে হতো, উঃ কী সুখ, ফুলের শয্যায় শুয়ে আছি রাজকুমার। হাতে পক্ষীরাজ খচরমচর করছে। দূরে দূরে বহুদূরে রাজপ্রাসাদের মিনারে, খুপরিঘরের গবাক্ষে একটি মুখ। রাজকুমারী বসন্তবালা। এক একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলছে যেন হাভানা চুরুটের ধোঁয়া। স্কাইলার্ক গম্বুজে বিরহের কাতরানি কাতরাচ্ছে। আমি মোগল রাজকুমার। আমার পিতা হরিশঙ্কর উচ্চ বিদ্যালয়ের আদর্শবাদী, পিউরিটান শিক্ষক নন, মোগল বাদশা। দাক্ষিণাত্য বিজয়ে গেছেন। সাড়ে সাতশোয় সংসার চালাবার টাকড়ানো দুশ্চিন্তা নেই। কলের মুখো করপোরেশনের অনর্গল জলধারার মতো জীবিকার মকরমুখ দিয়ে অর্থের ধারা নামছে। ক্যাঁচোর কোঁচোর তক্তাপোশ হাতির দাঁতের পালঙ্ক হয়ে উঠছে। লাল সিমেন্টের মেঝে হয়ে গেছে ইতালিয়ান মার্বেল। জানালায় জানালায় চিকনের পর্দার ফুরফুরে পাহাড়ি বাতাস। দূরে কোথাও, দূরে দূরে সানাই বাজছে দরবারিতে। আগামীকাল সকালে আমাকে আর টিউশানিতে যেতে হচ্ছে না। প্রতাপবাবুর পাঁঠা ছেলে ঘাড় কাত করে বসে আছে টেবিলে। ঠোঁটে কচি কচি গোঁফের রেখা। হাফপ্যান্ট ফুঁড়ে বেরিয়ে এসেছে উরুস্তম্ভ। সোঁটা সোঁটা লোম। বিচ্ছুর মতো দুটো চোখ। প্রতাপবাবুর দুঃস্বপ্ন। মাস্টার

পিটিয়ে আই এ এস করে দাও এই অ্যাসটাকে। পাঁচিশ টাকার বকবকানি। নাদুর দোকানে সপার্ষদ এক কাপ চা এটা ওমলেটের ব্যবস্থা। খানিক কান ফাটানো আলোচনা ঋত্বিক ঘটক, নেহরুর বিদেশ নীতি, কাফকার মেটামরফসিস, সুচিত্রা সেনের সাতপাক, বড়ো গোলামের বালম, হেমন্ত মুখোপাধ্যায়ের রানার, সোবার্সের সেঞ্চুরি, মিত্তির বাড়ির আরতি রোজ কেন এত রাতে বাড়ি ফেরে, অমরের নতুন কবিতা, বিমলের আর্মিতে ইন্টারভিউ, চুলে স্ক্রুকাট। বউদির বোনের হৃদয়হীনতায় সত্যেনের দেহত্যাগের সংকল্প।

সব যেন অতীতে ফেলে আসা কোনো জীবনের স্মৃতি। সুখের বিছানায় শুয়ে আছি রাজকুমার। এই পাড়ারই আর এক বিছানায় রাজকুমারী। মাঝে একের চার মাইল অন্ধকার রাতের ব্যবধান। দশ বারোটা, বাড়ি, তিন চারটে দোকান রাজকুমারী কমলা রঙের শাড়ি পরে সাদা চাদরে পাশ ফিরছে সবুজ মশারির ভেতর। একটু সর্দি হয়েছে। নাকটা ফোঁস ফোঁস করছে। ছোট্ট কপালের দুটো পাশ টিপ টিপ করছে যেখানে কাব্যের ভাষায়, চূর্ণ কুন্তল অবাধ্য হতে আছে। আষ্টেপৃষ্ঠে সর্দি জড়ানো নায়িকাদের মনে হয় প্রেমের জারক রসে কাচের বয়ামে ফাল্গুনের টোপাকুলের মতো জরে আছে। বুকের কাছে সাঁই সাঁই শব্দ বলছে, ভালোবাসি ভালোবাসি।

চোখ বুজে পড়ে আছি। মান্ধাতার আমলের তোশক। জায়গায় জায়গায় ডেলাপাকানো তুলো। ওয়াড়ের একটা জায়গা ছেঁড়া। তার মধ্যে থাকে আমার ক্ষুদ্র সঞ্চয়। দু-দশ টাকার নোট। চিৎ হয়ে শুলে মাথার ওপর বনেদি বাড়ির ছাত। দু-এক জায়গার প্লাস্টার খসে গিয়ে টালি বেরিয়ে পড়েছে। কবে খুলে কার মাথায় পড়বে নিয়তিই জানেন। এ সবই হল প্লেন লিভিং অ্যান্ড হাই থিংকিং-এর উদাহরণ। শুয়ে শুয়ে ভাবতে ভালো লাগে, পৃথিবীটা কী-সুন্দর! বন্ধুদের সঙ্গে আড্ডা আর যাকে ভালোবাসি, সে কাছে না থাকলেও নাড়াচাড়া করা। তার হাতে হাত ঠেকেছে। চোখে চোখ রেখেছি। এখনো অনেক কিছুই বাকি। এই বাকিটুকু কল্পনা। বাস্তবে করে দেখার ছাড়পত্র মেলেনি। যে ঘরে শুয়ে আছি, সেটা একটা হলঘর। সেই দূর কোণে আর একটা খাট। পাশে একটা টেবল, চেয়ার। টেবল ল্যাম্পের আলো। তপস্বী এক মানুষ লেখাপড়ায় ডুবে আছেন। অসীম জ্ঞানসমুদ্রে একটা ডিঙি ভাসছে। কত উপদেশ সন্তানকে! আলোর বৃত্তে পতঙ্গের মতো ঘুরে ঘুরে উড়ে উড়ে মরো না। ফার্স্ট ডিভিসন, ফাস্টক্লাস, ডক্টরেট। সম্মানের জীবিকা। নিরাপত্তা, সুখ। কে শুনছে! একটি বুকের আঁচল সরিয়ে কল্পনার চোখে দুধের মতো সাদা দুটি থলে বিস্ময়। মাথা রেখে কানাপাতা। ধকধক শব্দ। গলার কাছে শ্বাসপ্রশ্বাসের শব্দ। অন্ধকারে তরল দুটি চোখ। উত্তপ্ত নিঃশ্বাস। চিকন একটা হারের শীতল স্পর্শ। ফিস ফিস কণ্ঠস্বর, এই কী হচ্ছে! করছ কী তুমি! আমার হাত পৃথিবী পরিভ্রমণে মরিয়া!

ডেভিড লিভিংস্টোন। ডার্কেস্ট আফ্রিকা। ভিকটোরিয়া ফলস। মানুষের হাত। চিতার কাঠ ধরে, গোলাপের বৃন্ত ধরে, নুয়ে পড়া ডাল থেকে বাতাবি ছেঁড়ে। স্কুলের নগেন পণ্ডিতমশাই, উঁচু ক্লাসে যখন পড়ি, মন ভালো থাকলে সামান্য আদিরসাত্মক হতেন। নায়িকার দেহসুষমার বর্ণনায় বাতাবির উপমা টানতেন, কোরক থেকে ফল থেকে অলাবু। বর্ণনা বিশদ হতো। শরীরে পুল। সেদিন আমরা ফুটবলটা ভালো খেলতুম। রাতে গভীর নিদ্রা। স্বপ্নে ক্লিয়োপেট্রা!

বুঝলে, নিষ্ঠাই বড়ো কথা। লেগে থাকার ক্ষমতা। অনুশীলন। নিজেকে ছাঁকতে ছাঁকতে ঝিনুকের পেটের জলের মতো পরিশ্রুত করা গেল। একেশ্বরীবাদী। কারো দিকে তাকাই না। ভদ্র। বাজে বকি না। বাজে কাজে সময় নষ্ট করি না। শ্রীচৈতন্যের প্রেম, বুদ্ধের হৃদয়, শঙ্করের মেধা। জমি তৈরি। প্রেম ফেল করলে বৈরাগ্যের বীজ ছড়িয়ে দেওয়া যায়। হয় সংসার, খাট, বিছানা, সানাই, নয় শ্মশান। বলো হরি, বলো হরি।

অসুখ জিনিসটা যেমন খারাপ, আবার তেমনি উপকারীও। রোগশয্যার ধারে প্রেম দানা বাঁধে। তপস্বী পিতা একদিন সকালে আবিষ্কার করলেন তাঁর প্রশস্ত পৃষ্ঠদেশে মুক্তোরমালা তৈরি হয়েছে। আড়াআড়ি বেল্টের মতো। অসহ্য যন্ত্রণা। জ্বরও এসে গেল। তিনি তাঁর হোমিয়োপ্যাথির জ্ঞান দিয়ে বোঝার চেষ্টা করলেও চিকিৎসার জন্যে বন্ধু অ্যালোপাথ বিজয়বাবুকে ডাকতে বললেন। তিনি পরীক্ষা করে বললেন, ভোগাবে। ভাইরাস ইনফেকশন যে গো। এর নাম হারপিস জোস্টার। দেখছ না, বেল্ট লাইক ফরমেশন। পার্ললাইক কম্পোজিশন। রেস্ট অ্যান্ড অ্যাবসলিউট রেস্ট।

হল কেন? আমার তো অসুখ করার কথা নয়।

কেন নয়?

আমার মন খুব স্ট্রং, দুশ্চিন্তা করি না। আমার শরীরের ক্ষয় খুব কম।

এটা ক্ষয় ব্যাধি নয়। ভাইরাস ইনফেকশন।

ইনফেকশন মানে ইমিউনিটির অভাব। তার মানে শরীর উইক। তার মানে মন দুর্বল। তার মানে? মাঝখানে প্রশ্ন দু-পাশে দু-জন। ডাক্তার ও রোগী। তার মানে এজিং। বয়েস বাড়ছে।

তা তো বাড়ছেই। সে আর কী করা যাবে। সকলেরই বাড়বে।

ডাক্তারবাবু একটা ইনজেকশন দিয়ে তল্পিতল্পা গুটিয়ে চলে গেলেন। সংসারে সেবা করার মতো কেউ নেই। কর্তার স্ত্রী অনেক আগেই জীবন নাটক শেষ করে চলে গেছেন। একমাত্র ফলটিই সম্বল। ডাক্তারবাবু একটা লোশন দিয়ে গেছেন। তুলোয় ভিজিয়ে সাবধানে লাগাতে হবে। তাহলে একটু আরাম পাবেন। লাগাচ্ছি। ভয়ও করছে, যদি অসাবধানে লেগে যায়।

প্রশ্ন করলেন, বিরক্তি বোধ করছ?

বিরক্তি বোধ করব কেন?

সেবা জিনিসটাই তো বিরক্তিকর।

আমার কাছে নয়।

জানালার দিকে তাকিয়ে রইলেন। অতীত ভাবছেন। যার সেবা করার কথা, তিনি নেই। অসুস্থ হলে স্ত্রীর অভাব বোঝা যায়। স্ত্রীর কাছে যতটা সহজ হওয়া যায়, অন্যের কাছে ততটা সহজ হওয়া যায় না। এই সময় তনুশ্রী এসে গেল। কী হয়েছে বুঝতে যতটুকু সময় গেল, তারপর আমার আর কিছু করার রইল না।

এক একটা মেয়ের ভেতর সেবা থাকে। পরকে আপন করে নেওয়ার ক্ষমতা থাকে। আলাদা মশলা দিয়ে তৈরি। একই ওয়ার্কশপ থেকে বেরলেও মেটিরিয়াল আলাদা। ঝাঁ করে একবার বাড়ি চলে গেল, ফিরে এল একটা ব্যাগ নিয়ে। শাড়ি, শায়া, ব্লাউজ, চিরুনি, তোয়ালে ইত্যাদি নিয়ে। টাকা এল না, হিরে এল না, একটা মেয়ে এল, মনে হল পৃথিবীতে সত্যযুগ এসে গেল। সীমাহীন আনন্দ। মরা গাঙে বান ডাকল। ঘরেতে ভ্রমর এল।

রান্না করার একজন ঠাকুর ছিল। মনে হয় আলিপুর সেন্ট্রাল জেলের রাঁধুনি। সব রান্নারই এক স্বাদ। ভাত কখনো শক্ত, কখনো পিণ্ডি। খেতে বসে গাইতে ইচ্ছে করত, কেন চোখের জলে ভিজিয়ে দিলেম না। একটু অন্যমনস্ক না হলে মুখে দেওয়া দুঃসাধ্য হতো। ঠাকুর! এটা কী?

রুই মাছের দমপোক্ত।

ঠাকুর এটা কী?

মোচার কোফতা কারি।

সব এক রকম। হড়হড়ে তেল, ভড়ভড়ে গন্ধ। মুখে দিলেই মনে হবে মরে যাই। যে-কোনো আসামীকে খাওয়ালেই স্বীকারোক্তি বেরিয়ে আসবে। ধোলাই দেওয়ার প্রয়োজন হবে না।

তনু রান্নাঘরে ঢুকে পড়ল। কিছুক্ষণের মধ্যেই ভালো রান্নার সুগন্ধে বাড়ি ভরে গেল। তনুর মাস্টারমশাই সেই রোগযন্ত্রণার মধ্যেই বললেন, বহুকাল পরে অতীত ফিরে এল। মা যখন রাঁধতেন ঠিক এইরকম সুবাস বেরোতে। সামান্য ভালো।

মেঝেতে তোশক বিছিয়ে তনু বসল। রাত ক্রমশ এগোচ্ছে। মাস্টারমশাই স্যুপ খেয়েছেন। প্রশংসা এখনো ফুরোয়নি। পা মুড়ে কোলের ওপর হাত জুড়ে বসে আছে তনু, যেন ধর্মকথা শুনতে বসেছে। সামনে পড়ে আছে হ্যামলেট।

পড়া আর পড়ানো দুটোই হবে। সময়ের দাম কত। একটুও নষ্ট করা চলবে না। যা গেল তা চিরতরে গেল। আর ফিরবে না। একদিন বয়েস বেড়ে গেল, মৃত্যুর দিকে এগিয়ে গেল আরো একদিন।

আমরা তক্তপোশে বসে দৃশ্যটা দেখছি। তনুকে বোন ভাবার চেষ্টা করছি অনেকক্ষণ ধরে। ভয়ঙ্কর একটা অঙ্কর সঙ্গে ধস্তাধস্তি চলেছে সেই সন্ধে থেকে। খাতার তিনটে পাতা ভরে গেছে সংখ্যায়। সমাধানের সন্ধান মেলেনি। খাটের ওপর যিনি বসে আছেন তাঁর কাছে গেলে নিমেষ হয়ে যাবে জানি। একবার মাত্র তাকাবেন। মেনসিলটা হাতে নেবেন। তিন লাইনে উত্তর বেরিয়ে আসবে। হিয়ার ইজ ইয়োর অ্যানসার। সো সিম্পল, ধরতে পারলে না। আমার মাথা আর গর্দভের মাথায় কোনো তফাত নেই। মস্তিষ্কের ভাঁজ মনে হয় কম কম। জটিলকে সরল করতে পারে না, তার ওপর রণে ভঙ্গ দেওয়া স্বভাব। অঙ্কের ফাঁকে ফাঁকে তনুর দিকে চোখ চলে যাচ্ছে। কেমন বসে আছে লক্ষ্মী মেয়ে হয়ে। পিঠের দিকটা খুব সুন্দর। চওড়া ভারি কাঁধ। খোঁপা। সুগঠিত গলা। বোন হলে সর্বনাশ হয়ে যেত। তনু আমার প্রেমিকা। অঙ্কের মাথা না থাকতে পারে, প্রেমের মাথা বেশ ভালো। অঙ্কে ঢোকার ক্ষমতা নেই, হৃদয়ে ঢোকার ক্ষমতা আছে।

দু-জনে হ্যামলেটে বিভোর। কত রকমের ব্যাখ্যা। মাঝে নেসফিল্ড সাহেব আসছেন গ্রামার নিয়ে। শেলি, কিটস, বায়রন, ওয়ার্ডসওয়ার্থ ঢুকে পড়েছেন। গোটা ইংল্যান্ডের কবিকুল ঘরে। জন্ ডন, মার্লো। ইতিহাস আর সাহিত্য পাশাপাশি চলেছে। স্মৃতি থেকে বেধড়ক উদ্ধৃতিতে তাক লেগে যাচ্ছে। যে-কথা প্রায়ই বলেন সেইটাই মনে হয় ঠিক। ব্রহ্মচর্যে মেধা বাড়ে। বীর্য থেকে ওজঃ, ওজঃ থেকে মেধা।

আমার বন্ধু-কাম-গুরু কৈলাসের কাছে প্রবলেমটা ফেলেছিলুম। তনুর এমন অপমানজনক মেধা হল কী করে। ওই মেধার জন্যে নিত্য আমাকে অপমান সইতে হয়। ক্রমশই আমি ছাগলের স্ট্যাটাসে নেমে যাচ্ছি। কৈলাস বলেছিল, মেধা কেন হবে না। মেয়েদের তো বীর্যই নেই। ক্ষয়েরও কোনো প্রশ্ন নেই। মেধা-নাড়ি নিয়েই জন্মায়। সেই কারণেই তো মা সরস্বতী। বাবা সরস্বতী হল না কেন! বিদ্যার এলাকাটাই হল মেয়েদের। বীণা বাজাবে, কথাকলি নাচবে, সাহিত্য শিল্পে পারদর্শী হবে। খনার কথাই ভাব না। শ্বশুরমশাই হেরে গেলেন। অ্যাস্ট্রোনমি, অ্যাস্ট্রোলজি, ফিজিকস, কেমিস্ট্রি, পলিটিকস, সব মেয়েদের। বিদ্যা শব্দটাই তো স্ত্রীলিঙ্গ। ছেলেরা মাটি কোপাবে, মোট বইবে, গাড়ি চালাবে, কল চালাবে, ফুটবল খেলবে, আড্ডা মারবে। এর জন্যে লজ্জার অধোবদন হওয়ার

তো কোনো কারণ দেখি না। আমরা তো মা সরস্বতীকে পুজো করি। তনু হল জ্যান্ড সরস্বতী। পুজো করবি, পায়ের বুড়ো আঙুল ডোবানো চরণামৃত পান করবি। এতে লজ্জার কিছু নেই।

মন এমন বেয়াড়া জিনিস, নিজের ভাবনায় নিজেকেই ঘাবড়ে যেতে হয়। একবর মনে হল, তনুকে শেষে ম বলতে হবে না কী! এত প্রশংসা, এমন বিমোহিত অবস্থা। দৃষ্টিতে এত প্রেম! তনু ছাড়া জীবন অচল! কখনো বলছেন, তাহলে তুই এইবার একটু গান গা। তনু সঙ্গে সঙ্গে গাইছে, তোমার অসীমে। কখনো বলছেন, এইবার একটু চা খাওয়া। তোর হাতের চা তুলনাহীন। কখনো বলছেন, এইবার একটু শুয়ে পড়। তনু এক রাউন্ড ঘুম দিয়ে উঠছে।

আজ্ঞাপালনের এমন অপূর্ব দৃষ্টান্ত খুব কম দেখা যায়। তনু বলেছিল, গুরু শিষ্যের সম্পর্কটা এইরকমই হওয়া উচিত। শিষ্য গুরুর সঙ্গে মিশে যাবে। তার আলাদা কোনো অস্তিত্ব থাকবে না। তোমার বাবা, তাই তুমি বুঝতে পার না, এমন একজন মানুষ হয় না লাখে একটা। মেঘের মতো প্রেম।

গুরু কৈলাসকে জিজ্ঞেস করলুম, মেঘের মতো প্রেম জিনিসটা কী! তনু বলেছে।

ভালো বলেছে। মেঘ যখন বৃষ্টি ঢালে, সারা দেশ ভেসে যায়। মানুষ চেষ্টা করলেও পারবে না। পিচকিরি দিয়ে, শাওয়ার দিয়ে কতটা জায়গায় জল দেওয়া যায়! সামান্য জায়গায়। বৃষ্টির জল মাটিতে পড়ামাত্রই জীবন। পিনপিন করে গাছপালা বেরোতে লাগল। চারপাশ সবুজে সবুজে সবুজ। পৃথিবীতে মেঘের ভালোবাসা বৃষ্টি হয়ে ঝরে। মেঘ কিছু চায় না। নদী পুকুর সব ভরভরন্ত করে দেয়। বীজের ঘুম ভাঙায়। নিজে ফুরিয়ে যায়। আকাশ ছাপিয়ে যখন বৃষ্টি নামে তখন কোনো ফাঁকা মাঠে কী নদীর ধারে একেবারে একা গিয়ে দাঁড়াবি, দাঁড়ালেই বুঝতে পারবি কী আবেগ! কী কোমল আলিঙ্গন! গাছের তলায় দাঁড়িয়ে পাতায় পাতায় শুনবি বৃষ্টির গান। শুনতে পাবি কবিতা। তোর তনুশ্রী যে-কোনো দিন কবি হয়ে যাবে।

অনেক রাতে যখন ঘুম আসে না, তখন তাকিয়ে দেখি, রুগির বিছানায় তনু একপাশে আড় হয়ে সেবা করছে। মৃদু স্বরে বলেছে, মাস্টারমশাই খুব কষ্ট হচ্ছে! কী করি বলুন তো!

কী করবে মা, আনন্দ শেয়ার করা যায়। যন্ত্রণা নিজেকেই ভোগ করতে হয়। শেয়ার করা যায় না। ম্যান শুড সাফার অ্যালোন। গভীর রাত। সবাই গভীর ঘুমে, তুমি শুধু একা জেগে বসে আছো তোমার যন্ত্রণা নিয়ে। সহ্য করার চেয়ে বড়ো সাধনা আর কিছু নেই।

আপনি একটু শোবার চেষ্টা করুন। আমি আস্তে আস্তে সুড়সুড়ি দিয়ে দিই।

ওতে কিছু হবে না মা, তুমি এইবার একটু শুয়ে পড়ো।

শেষ রাতে ঘুম ভেঙে গেল। মেঝের বিছানার দিকে তাকিয়ে দেখি তনু হাঁটু গেড়ে হাত জোড় করে বসে আছে প্রার্থনার ভঙ্গিতে। ভোরের নরম আলোয় যেন একটা পাথরের মূর্তি বসে আছে। ভোরের নদী, ঘুম ভাঙা অরণ্য, বাসা থেকে ওড়ার চেষ্টা করছে সাদা একটা পায়রা, নদীর জলে স্নানে নেমেছেন কোনো বৈষ্ণব, জল ভাঙার চুনচুন শব্দ। পুকুর ঘাট ছেড়ে একটা হাঁস ঢেউ কেটে কেটে চলেছে এপার থেকে ওপারে। এই সবই হল পবিত্র পৃথিবীর দৃশ্য।

স্তব্ধ হয়ে তনুর প্রার্থনা দেখতে দেখতে মনে হয়েছিল, আমি খুব নীচের তলায় মানুষ। যার কাছে দীক্ষা নেওয়া উচিত তাকে আমি কুকুরের মতো কামনার জিব দিয়ে চাটার চেষ্টা করছি। আমি একটা দ্বিপদ জন্তু।

পৃথিবীতে কত রকমেরই না মানুষ আছে। একজন অষ্টাবক্র লোক, পাড়াতেই থাকে। যাওয়া আসার পথে প্রায়ই দেখা হতো। হাঁটার ধরণটা ছিল গেরিলার মতো। কৈলাস বলত, কোত গরদান তাংপিছানি, দোনো হ্যায় বজ্জাতকি নিশানী। বড়োবাজারে ব্যবসা। গায়ে অফুরন্ত তেল ডলে চান করেন। রোজ রাতে রাবড়ির হাঁড়ি হাতে বাড়ি ফেরেন। কোনো অনুষ্ঠানে চাঁদা চাইতে গেলে তিনঘণ্টা দাঁড় করিয়ে রেখে একটা টাকা ছাড়েন। ধরা আর ছাড়া অর্থনীতির একমার কৌশল। ধরার সময় যতটা তৎপর, ছাড়ার সময় ঠিক ততটাই শ্লথ। তবেই মানুষের অর্থভাগ্য খোলে। কৈলাস ভদ্রলোকের নাম রেখেছিল বজ্রবাঁটুল। স্ত্রী খুব সুন্দরী। সেই কারণে আমরা বলতুম, বিউটি অ্যান্ড দ্য বিস্টের বাড়ি। মাঝে মাঝে আমাদের প্ল্যান হত, বজ্রবাঁটুলের কারাগার থেকে কেমন করে ওই বন্দিনী সুন্দরীকে উদ্ধার করা যেতে পারে। পয়সা দেখে বিয়ে দিয়েছে মেয়ের বাপ। এইরকম অসম মিলন সহ্য করা যায় না। ভদ্রমহিলাকে দেখলে আমরা বলতুম, ক্যাপটিভ লেডি।

বজ্রবাঁটুল কারো সঙ্গে কথা বলতেন না। বাড়িতে কারোকে আপ্যায়ন করতেন না। ভয় ছিল, বউ যদি পালায়। সিনেমা যে কোনো সময় মানুষের সর্বনাশ করতে পারে। সেই বজ্রবাঁটুল হঠাৎ মোড়ের মাথায় দাঁড়িয়ে পড়লেন আমাকে দেখে।

শুনলুম, মাস্টারমশাইয়ের খুব খারাপ একটা অসুখ করেছে!

ঠিকই শুনেছেন, হারপিস জোস্টার।

ভেনার‍্যাল ডিজিজ।

ভেনার‍্যাল নয়, ভাইরাল ডিজিজ।

ওই হল, একই ব্যাপার। ওঁর মতো চরিত্রের মানুষের এই হল! ঘোর কলি। তা শুনলুম ঘরসংসার ছেড়ে এসে সেবা করছে বিপ্লববাবুর মেয়ে। ব্যাপারটা কী বলো তো। যে বাড়িতে আইবুড়ো একটা ছেলে, সেই বাড়িতে আইবুড়ো

একটা মেয়ে রাত কাটাচ্ছে, এও তো আর এক ভেন্যারাল ডিজিজ তোমাদের ফ্যামিলির আর কোনো প্রেস্টিজ রইল না। তোমার ঠাকুরদার নামে চুনকালি পড়ল। বাড়িতে দ্বিতীয় কোনো মহিলা নেই। রাতের পর রাত। ভাবতেও আমার কেমন লাগছ। ভদ্রলোকের পাড়া। বেশ মজায় আছো, কী বলো।

প্যাঁচার মতো হাসছে লোকটা। কথার মধ্যে থলথলে ইঙ্গিত। বেশ আনন্দ পাচ্ছে। আমার মনে হচ্ছিল মারি এক ঘুসি। নিচের দাঁতটা ফেলে দিই। কোনোরকমে নিজেকে সংযত করে বললুম, কেন নোংরা কথা বলছেন?

তোমরা নোংরামি করছ বলে। মাস্টারমশাইয়ের কাছে ছাত্ররা গিয়ে কী শিখবে। বৃন্দাবন লীলা। বিশাল একটা রবারের পুতুলের মতো লোকটা হেলেদুলে চলে গেল। আমি হাঁ করে দাঁড়িয়ে রইলুম কিছুক্ষণ। আর ঠিক সেইসময় কৈলাস এসে পড়ল সাইকেলে চেপে। কৈলাস দাদার কারখানায় যাচ্ছে খাবার পৌঁছে দিতে। সাইকেলের হ্যান্ডেলে টিফিন ক্যারিয়ার ঝুলছে। রাস্তায় পা রেখে দাঁড়িয়েছে। কী হল, এমন গরুচোরের মতো দাঁড়িয়ে আছিস!

বজ্রবাঁটুল যা-তা বলে গেল, তনু আমাদের বাড়িতে আছে বলে। খারাপ খারাপ কথা।

তুই কী বললি?

কিছুই তেমন বলতে পারলুম না।

তুই বেটা ছোটোলোকের মতো ভদ্রলোক। ঠাস করে একটা চড় মারতে পারলি না। তনু তোদের বাড়িতে আছে তো ওর বাবার কী। ব্যাটা রক্ষেকালীর বাচ্চা। তুই এবার থেকে রোজ বিকেলবেলা তনু র হাত ধরে বেড়াতে বেরোবি। ওই মদনা ব্যাটার বাড়ির সামনে দাঁড়িয়ে খুব হ্যা হ্যা, হা হা করবি। হিন্দি গান গাইবি। এই মাঘেই তোর সঙ্গে তনুর বিয়ে দোবো। আমার খুব কষ্ট হবে ঠিকই। বুক ফেটে ভেঙে যায় মা; কারণ তনুর তরীতে আমিই ভাসব ভেবেছিলুম।

তনু আমার মতো বেকারকে বিয়ে করবে কেন?

ওর বাপ করবে। তনু তোকে ভালোবাসে।

তনু আমাকে নয় আমার বাবাকে ভালোবাসে।

মাস্টারমশাইকে একভাবে ভালোবাসে। তোকে আর এক ভাবে। সময় পেলে কথামৃত পড়বি। সেখানে ঠাকুর একটা সুন্দর কথা বলেছেন। একই বিছানা। ডানপাশে স্বামী, বাঁ-পাশে ছেলে। ছেলেকে আদর করার সময় এক ভাব। স্বামীকে আদর করার সময় আর এক ভাব। তুই একটা চিরকালের বোকা, কিছুই বুঝতে পারিস না। দুটো ভালোবাসার টানে তনু সংসার থেকে ছিটকে এসেছে।

অতীতের স্মৃতি হল গর্তের সাপ। মাঝে মধ্যে হিল হিল করে বেরিয়ে আসে। সে আবার ময়াল সাপ। শরীরে চাকা চাকা গোল গোল বর্ণবাহার হল

এক একটা উজ্জ্বল ঘটনা। বিয়েটা মাঘেই হল। যেমন হয় বোকা বোকা সাজ। গরদের পাঞ্জাবি। কোঁচানো, চুনট করা ধুতি। পায়ে নিউকাট। মিনমিনে পালিশ। মামাতো বোন সুধা লবঙ্গ দিয়ে মুখে চন্দনের ফোঁটা মেরেছে। চন্দনে পাঞ্চ করা ছিল তিলক মাটি। জেল্লাটা ভালোই খুলেছিল বোকা বোকা মুখে। কৈলাস সেজেছিল কর্তা-ব্যক্তির মতো। মালকোঁচা মারা ধুতি, হাফ হাতা শার্ট। আমার চেয়ে তার আনন্দ বেশি। মাঝ সমুদ্রের ভাসমান জাহাজকে বন্দরে ভিড়িয়েছে কাপ্তেন কৈলাস। বউভাতে নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল বজ্র বাঁটুলকে। লোকটা মহা পাজি। চলে যাওয়ার সময় চ্যাকোর চ্যাকোর পান চিবোতে চিবোতে বলে গেল, ধন্যবাদটা আমাকেই দিও হে ছোকরা। বিয়েটা আমিই এগিয়ে দিলুম। ব্যাপারটা তা না হলে জট পাকিয়ে যেত।

সংসারের প্রবেশপথটা খুব সুন্দর। খিলান, মেহগনি কাঠের পালিশ করা দরজা, মাথার ওপর পোঁ ধরেছে সানাই। জুঁই-রজনী গন্ধ ছড়াচ্ছে। অভাব, অভিযোগ, দুঃখ কষ্ট সব বেনারসি চাপা। শাশুড়ির গয়নায় সেজে ও বাড়ির বউ এসেছে এ বাড়ির নিমন্ত্রণে। এক রাতের জন্য ভেতরের দৃশ্যটা আরব্য রজনীর মতো। হলুদ-লাল আলোর ছায়া। ভেলফেটের আদিম ঝালরে মিহি চিনির মতো আলোর গুঁড়ি। আমির, ওমরাহ, বাদশা, বেগমদের জমায়েত। শান্তিদি ভাঙা গালে পাউডার ঘষেছে। চোখে কাজল। বিশ বছর আগে ফেলে আসা যৌবন থেকে নজর ধার করে মোহময়ী হয়ে আমাকে ফিসফিস করে বলছে, কী করতে হয় জানিস তো! না, আড়ালে আয় বলে দিচ্ছি।

শান্তিদি আমার হাতটা চেপে ধরল। মাঝের আঙুলে একটা তামার রিং, তার পাশের আঙুলে একটা সিসের রিং। হাতের তালুটা খুব গরম। লম্বা লম্বা, সরু সরু আঙুল। বেশ লম্বা। ছিপছিপে শরীর। আমাকে টানতে টানতে একেবারে ভাঁড়ার ঘরে। ঘরে কেউ নেই। সবাই নতুন বউকে সাজাতে ব্যস্ত। শান্তিদি একেবারে আমার বুকের কাছে। আজ খুব যত্ন করে চুল বেঁধেছে। বুকের আঁচল একপাশে সরে গেছে। লাল চকচকে ব্লাউজ।

'তোকে আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে বিলু। তোর চেহারাটা আজ খুব সুন্দর দেখাচ্ছে।' মুখটা ধারালো। নাকটা খাড়া। চোখ দুটো বাদাম চেরা। পাতলা তিরতিরে ঠোঁট। এইরকম মুখ আর চেহারার একটা আকর্ষণ আছে। কী করতে চাইছে বোঝার আগেই, দু-হাতে গলা জড়িয়ে ধরে শান্তিদি আমার ঠোঁটে বেশ ঘন করে চুমু খেয়েই দূরে সরে গেল। সেই মুহূর্তে আমি কেমন যেন হয়ে গেলুম। সাপ যেন ছোবল মেরে দূরে সরে গেল। শান্তিদি খুব দ্রুত নিঃশ্বাস ফেলছে। বুকের ওঠানামা। অদ্ভুত একটা গলা করে বলল, তুই সরে যা, আমার সামনে থেকে সরে যা।

বড়ো বড়ো গামলায় রসে ভাসছে, রসগোল্লা, পান্তুয়া, হলদে হলদে কমলাভোগ। সব যেন ফ্যাল ফ্যাল করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে। আমি বোকার মতো পায়ে পায়ে সেই ঘর থেকে বেরিয়ে গেলুম। নানারকম মশলার গন্ধ। একটা একশো পাওয়ারের আলো। দেয়ালের রঙ ময়লা। কাঠের একটা টেবিলের ওপর অনেক শালপাতা। কিছু কাঁচা পাঁপড় মেঝেতে ছড়িয়ে আছে।

শান্তিদির জীবনটা ভেঙে গেছে। বড়োলোকের মেয়ে ছিল, আদুরে মেয়ে। নামি স্কুলে পড়তো। ভালো নাচত। বাবার ব্যবসা ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফুলে ফেঁপে উঠেছিলেন। শেষের দিকে একের পর এক ব্যাংক ফেল করতে লাগল। গণেশের পর গণেশ ওল্টাচ্ছে। হঠাৎ যুদ্ধ শেষ। দেশ বিভাগ। রায়ট। স্বাধীনতা। শান্তিদির বাবা পাগল হয়ে গেলেন। বিক্রি হয়ে গেল স্টুডিবেকার গাড়ি। একটা বাগান ছিল, বিক্রি হয়ে গেল। লোকজন, পোষ্যরা সব ভেগে গেল। দুটো অ্যালসেশিয়ান কুকুর ছিল, খেতে না পেয়ে মরে গেল। অনেকেরই উল্লাস ব্যাটা বাঙালি, খুব লপচপানি হয়েছিল। বেলুন এইবার চুপসেছে। শান্তিদির মায়ের নামে নানা কেচ্ছা। প্রশ্নতেই উত্তর, সংসারটা চলছে কী করে। মেয়েদের তো একটাই ক্যাপিটাল। শান্তিদির লড়াই সেই থেকে শুরু। রাস্তার দিকের দোতলার বারান্দায় শান্তিদির বাবা বসে থাকতেন, আর থেকে থেকে চিৎকার করতেন চিল চিল ছোঁ মারলে, ছোঁ মারলে। মানুষটাকে কেউ দেখত না। মাঝে মাঝে মারধোর করত। এখনো মনে আছে, শান্তিদির মা আর বড়োমামা এমন মেরেছিল, ভদ্রলোকের চওড়া পিঠে লাল লাল, সোঁটা সোঁটা দাগ। রাস্তা দিয়ে যে যাচ্ছে তাকেই দেখাচ্ছেন, এই দেখো এই দেখো, আমার পিঠে জমা খরচ। এরপর ইলেকট্রিক শক দিয়ে মেরেই ফেললে। শান্তিদির বিয়ে হতে হতেও হল না। রটনা, মায়ের জন্যেই হল না। একজন আর্টিস্ট খুব ঝুঁকেছিল। শান্তিদিকে মডেল করে অনেক ছবি এঁকেছিল। পড়তি জমিদারের ছেলে। রোজগার না থাক বাড়ির মেঝে মার্বেল পাথরের। শান্তিদির মাকে আমরা বলতুম, হোয়াইট টাইগ্রেস। যৌবনের পড়ন্ত আলোয় বসে থাকা সেই মহিলাকে আমরা দেখেছি। মেয়েদের সংসার ভেঙে গেলে আর কিছু থাকে না। রূপ আর দেহ হল বিয়েবাড়ির বাইরে ডাস্টবিনের ধারে ছড়িয়ে পড়ে থাকা এঁটো পাতার মতো। কুকুরের দল এসে সারারাত ছেঁড়াছিঁড়ি করে ভোরে চলে যায়।

সংসার একটা নেশা। চিনেপাড়ার ওপিয়াম ডেন। দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে দেখলে দৃশ্যটা এইরকম, গুহার মতো একটা জায়গা, ভেতরটা ধোঁয়া ধোঁয়া। আলোটা নেশায় লাল। কেউ শুয়ে, কেউ বসে, কেউ আধশোয়া, মেয়েরা নেচে নেচে ঘুরছে। অস্ফুট গুঞ্জন, জড়িত কণ্ঠ, শিথিল হাতে বিচলিত কোনো সুন্দরীর পোশাকের প্রান্ত আঁকড়ে ধরার চেষ্টা। কেউ বুকে হেঁটে এগিয়ে চলেছে যেখানে

নিল কাচের পাত্রে রয়েচে লাল চেরি। যে একেবারে বেহুঁশ তার সর্বস্ব হরণ করে নিচ্ছে নেশামণ্ডলের অধিকারী। যে স্বেচ্ছায় ঢুকছে, সে আর বেরোতে পারছে না। একটু একটু করে চুর হতে হতে বুঁদ। মিষ্টি ঘণ্টাধ্বনি, সিল্কের খসখস শব্দ, মশলার গন্ধ, শালুকের কাণ্ডের মতো ললিত হাতের ছোবল, ঝিনুকের কপালে ভোরের সূর্য, গোলাপি অন্ধকারে খইয়ের মতো জোনাকির আলো। সাদা রেশম ঢাকা একজোড়া বাতাবি, মাঝে পিঁপড়ের পায়ে হাঁটার পথ। শিলাজতুর পিচ্ছিলতা। মিহি বৃষ্টির মতো আসক্তি। যন্ত্রণা, চাপা আর্তনাদ, ফাঁদে পড়া পশুর অসহায়তা। নেশার গলায় কেউ বললে, বহুত আনন্দ। সঙ্গে সঙ্গে সেই গহ্বরে সবাই গুঞ্জন করে উঠল, আনন্দ, আনন্দ। কেউ বললে, বড়ো যন্ত্রণা। সঙ্গে সঙ্গে গুঞ্জন, যন্ত্রণা। কেউ তেঁড়েফুঁড়ে উঠল, মুক্তি, মুক্তি। অধিকারীর নিষ্ঠুর গলা, মুক্তি। ভোরের আগে মুক্তি নেই। গুহার বাইরে বিবেকের গান শোনা যাবে,

লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ, পথিকের করে সর্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী, শম দম দুই জনে।
সাধুসঙ্গ নামে আছে পান্থ-ধাম, শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে শুধাইবে পথ, সে পান্থ-নিবাসীগণে।
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার, প্রাণপণে দিও দোহাই বাজার,
সে পথে রাজার প্রবল প্রতাপ, শমন ডরে যাঁর শাসনে।

শোনা গেলে কী হবে! জীবন-আফিমের নেশা বড়ো ভয়ঙ্কর। একবার ধরে গেলে আর তো ছাড়া যায় না। চোরাবালির মতো ক্রমে ক্রমে গ্রাস করে। প্রেম, বিরহ, মূর্ছা। উৎসবের রাত তার যাবতীয় আড়ম্বরের চকমকি খসিয়ে সাধারণ রাত হয়ে গেল। হাতা-খুন্তি, চটের ব্যাগের জীবন। হিসেবের খাতা। আয়ের ঘরে একটা লাইন তো ব্যায়ের ঘরে একশোটা।

তবে ভার্যা যদি মনোরমা হয় তাহলে অভাবেও কত ভাব!

কিছু পয়সা সঞ্চয় করে সেই পুরীতে বেড়াতে যাওয়া। ঢেউ ভেঙে ভেঙে পড়ছে। সুইস সুইস শব্দ। ফ্যানার বুজবুজি। পায়ের দিকের শাড়িটা সামান্য উপর দিকে টেনে তুলে তনুশ্রী ভাঙা ঢেউ মাড়িয়ে হাঁটছে, ছুটছে, লাফাচ্ছে। বাতাসে শাড়ির আঁচল উড়ছে। এলো খোঁপা লুটোপুটি খাচ্ছে চওড়া পিঠে। নিল আর সবুজের মহাখেলা।

কে আমি?

আমি তখন রাজকুমার। কোনো প্রতিষ্ঠানের দাস নই। দু-পাশে হাত ঝুলিয়ে ন্যালাখ্যাবলার মতো দিনে অন্তত একবার বড়োকর্তার টেবিলের সামনে করুণ মুখে দাঁড়াতে হয় না কী আমাকে! সেই বড়ো দাস এই ছোটো দাসটিকে উন্মোচন করে বড়োই আনন্দ পেয়ে থাকেন! আত্মসম্মানের আলখাল্লাটিকে

ছিঁড়ে ফেলে তিনি বাক্যের লিঙ্গ দিয়ে ধর্ষণ করেন। সামনের চেয়ারে বসার অধিকার নেই। মানুষ হলেও সবাই তো মানুষ নয়। কত টাকার মানুষ তুমি? হাতিবাগানের হাটের জামা, না টিকিট লাগানো বড়ো দোকানের দামি জামা! তুমি কার্পেট না পাপোশ। তোমার মতো ইডিয়েট তো আমি দুটো দেখিনি! পয়সা খরচ করে লেখাপড়া শিখেছিলে, না চালকলা দিয়ে! এটা কী হয়েছে? এটা কী? হোয়াট এ মেস! এটা তোমার বাপের আপিস! গুপ্তকে তুমি অর্ডারটা ইস্যু করলে কার হুকুমে!

—আজ্ঞে, আপনিই তো স্যার সই করেছিলেন!

—শাট আপ ইউফুল! নৃপেনবাবু ধরিয়ে না দিলে আমি ধরতেই পারতুম না!

—কী ধরালেন স্যার! গুপ্তরটাই তো লোয়েস্ট রেট!

—নো, নো স্যার। লোয়েস্ট ব্যানার্জির। গুপ্তরটা প্যাকিং অ্যান্ড ফরোয়ার্ডিং এক্সক্লুডেড। ব্যানার্জিরটা ইনক্লুডেড। সেই যোগটা কে করবে! আমি, না আমার বাবা! রেজাল্ট! কোম্পানির এক লাখ টাকা গচ্চা। এই টাকাটা কে দেবে! ইয়োর ফাদার। শুনেছি, তুমি নাকি কাজ করতে করতে গুনগুন করে গান গাও! এত ফুর্তি কীসের!

—স্যার! এবারের মতো মাপ করে দিন! আমি এতটা খেয়াল করিনি স্যার।

—যাও। এখন গুপ্তর হাতে পায়ে ধরে অর্ডারটা ইউথড্র করে আনো।

—সেটা কী সম্ভব স্যার। একবার ইস্যু করা হয়ে গেছে।

—সম্ভব কী অসম্ভব সে তো জানি না। কত টাকা খেয়েছিলে! ভমিট ইট আউট। হয় এক লাখ টাকা পে করো, আর তা না হলে উইথড্র করে আনো।

—আপনি আমাকে বাঁচান স্যার। সবে বিয়ে করেছি।

কে বলেছিলেন, সেই শ্রীকৃষ্ণ না কী উপনিষদ! তুমি যে-সে নও। তোমার ভেতরে আছে লিঙ্গশরীর। অর্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ, জ্যোতির্ময় এক লাইটার। তার মধ্যে আছে তরল গ্যাস। স্পিরিট। চৈতন্যের চাকা লাগানো। বুড়ো আঙুলে দিয়ে খটাং করলেই আত্মার আলোয় উদ্ভাসিত। বাক্যের অস্ত্র তোমাকে বিদ্ধ করতে পারবে না। নিতম্বে বাক্যের পদাঘাত তোমাকে ভূপতিত করতে পারবে না। চাকরি চৌপাট হলেও অনাহারে ভেটকে যাবে না। তুমি বুদ্ধু হলেও বন্ধ। তুমি জন্মেছ না কী! যে মৃত্যুর কথা ভাবছ।

অর্ধাঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ আত্মার স্বর্গীয় লাইটার বড়োবাবুর পায়ের কাছে পড়ে আর্তনাদ করছে, বাঁচান স্যার, আমাকে বাঁচান। গুরু কৃপা নয় ঈশ্বর কৃপা নয়, আপনার কৃপা চাই।

—ওটা যদি না পার, তাহলে এইটা তো পারবে, ব্যানার্জিকে গিয়ে বলো, ইনক্লুডেড-এর বদলে এক্সক্লুডেড লিখিয়ে এনে ফাইলে ঢোকাও।

অঙ্গুষ্ঠ পরিমাণ আত্মপুরুষ এইবার ব্যানার্জির পদতলে। তুমি ব্রহ্মা, তুমি বিষ্ণু, তুমি মহেশ্বর। সখা তুমি, পিতা তুমি। এইবার সে বাড়ি ফিরছে। সম্মানিত, সম্ভ্রান্ত, তনুশ্রীর স্বামী। মুখে একটা হাসি ঝুলিয়েছে। টান টান খাড়া। অপমানের কাদা, উপেক্ষা আর উদাসীনতার জলেধুয়েছে, বগলে একপাউন্ড পাঁউরুটি। সংস্কৃতিমনস্ক এক যুবক। ময়দানে বঙ্গসংস্কৃতি। দেবব্রত বিশ্বাসের উদাত্ত কণ্ঠে, আকাশ ভরা সূর্য তারা। জোড়াসাঁকোয় রবীন্দ্রজয়ন্তী। সিনেমার পর্দায় ফেলিনি, ত্রুফো, আইজেনস্টাই, টেস্ট ক্রিকেটে মার্চেন্ট, ওয়াদেকর, সাহিত্যে কামুকাফকা সার্ত্র। লাল জামার রাজনীতি, পুঁজিবাদে আগুন লাগাও। শ্রমিক তুমি পার্লামেন্টে হাতুড়ি ঝোলাও। বন্ধুগণ! নেচে ওঠো। বিধান রায়কে চটকে দাও, প্রফুল্ল সেন কলা খাও, অতুল্য ঘোষ নিপাত যাও। গণনাট্যসঙ্ঘের গান টেবলে তাল ঠুকে। কাঁধে ব্যাগ ঝোলা ইনটেলেকচ্যুয়াল, ঝুলঝাড়ু মাথা, ক্যালকাটা হ্যান্ডলুম পাঞ্জাবি, জয়নুল আবেদিনের দুর্ভিক্ষের ছবি। এইসবের ভেতর দিয়ে উড়তে উড়তে আসছে তনুশ্রীর প্রেমিক। আত্মার ঝাড়লণ্ঠন, সংস্কৃতির সার্চলাইট; না-বোঝা কথার ফুলঝুরি। সুন্দরী স্যুটকেস খুলো না, তাহলে পায়ের ফাঁকে লেজ ঢোকানো একটা লেড়ি কুকুর বেরিয়ে পড়বে। পায়ের ওপর দিয়ে চাকা চলে গেলে কুকুর যেরকম আর্তনাদ করে সেই রকম আর্তচিৎকার বুকে চাপা আছে। তবু মুখে এক ফালি কাঁচা হাসি। স্ত্রী মনে করছে, সফল, সম্মানিত এক মানুষ সারাদিনের পর ফিরে এল। কর্মই যার ধর্ম। ছেলে আদো-আদো গলায় বলবে, আমি বাবার মতো হব। কনিষ্ঠরা পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করে বলবে, আশীর্বাদ করুন। কাকে বলছে জানে না। যে-জানে সে বসে আছে অন্নদাতা হয়ে। তার চোখে এই লোকটা একটা ইডিয়েট ভৃত্য। প্রতিটি টাকায় সেই কথা লেখা আছে। এই জামার ডিজাইন সেই-গালগাল, এই উদরের অন্ন সেই গালাগাল। এমন কী রাতে, যখন সে স্ত্রীকে বুকে নিয়ে শুয়ে আছে তখন সেই মশারির চালে ওই কাঁচি ছাঁটা সেনগুপ্ত সায়েবের মুখ। কুতকুতে চোখ, ঘোঁতঘোঁত গলা, আবার বিয়ে করা হয়েছে! প্রেম! ছেলে হবে, মেয়ে হবে। লেখাপড়া, দুধ, মাছ, জামাকাপড়, পেনসিল,খাতা, শীতের চিড়িয়াখানা, আইসক্রিম, হাজার টাকার লপচপানি, গেঁড়িগুগলির সংসার! সব আমার হাতে। মুহূর্তে ফিউজ করে দিতে পারি। জমিদার বাড়ির বাগানের একপাশে, নর্দমার ধার ঘেঁষে চাকরবাকরের ঘর। জমিদারবাবুর চোখে কর্তাটি শুয়োরের বাচ্চা। সারাদিন খিদমত খাটে। অনেক রাতে দু-ঢোক খেয়ে রামুর

মার পাশে ধাড়ি একটা শূকরের মতোই শুয়ে পড়ে। অদৃশ্য লম্বা একটা জিব বের করে ক্ষতস্থান লেহন করে। বাপের বেটা রামু শামুকে জড়িয়ে চটের বিছানায় শুয়ে আছে। বারোমসাই সর্দি, টনসিল, আমাশা, চোখে ঘা।

রামুর মায়ের পেটে আর একটা ঘাই মারছে। রামুর বাবা মানুষের কথা শুনেছে, মানুষ ঠিক কী জিনিস তা জানে না। এইটুকু জানে, এক ধরনের মানুষ আর এক ধরনের মানুষকে জুতো মেরে টাকা দেয়। ভয় দেখায়। একমাত্র নিজেকেই মানুষের মতো মানুষ ভাবে, বাকি সব ছাগল। অনেক বই পড়ে, বক্তৃতা দেয়, ভোটে দাঁড়ায়, বিরাট ঠাকুরঘরে বসে পুজো করে আর অন্য মানুষের মাথা চিবিয়ে খায়। পৃথিবীটাকে এরা নিজেদের মধ্যে বেশ ভাগ করে নিয়েছে। বাকি সবাই নর্দমার ধারে সার্ভেন্টস কোয়ার্টারে শকূরের পাল।

পুরীতে গিয়ে সাতদিনের জন্যে এইসব কথা ভোলা গিয়েছিল। অফিসের সেই হলদে বাড়িটা নেই। ছাঁটা গোঁফ সেনগুপ্ত নেই। তাকে ঘিরে মোসায়েবদের সংকীর্তন পার্টি নেই, মনুমেন্টের তলায় মানবশৃঙ্খল উন্মোচনের গণসংগীত নেই, সেইসব ম্যাগাজিন নেই যার পাতায় পাতায় সমাজতত্ত্ব, রাষ্ট্রতত্ত্ব, ধর্মতত্ত্ব, বিত্ততত্ত্ব, পৃথিবীর নতুন মডেলের কথা, কাঁড়ি কাঁড়ি উপদেশ, রামমোহন থেকে রবীন্দ্রনাথ, বাংলার নবজাগরণের প্রলয়কাণ্ড। সেই বাঙালি। যারা সায়েবের জুতোর ফিতে বাঁধত, আবার বুকে হাত রেখে বীর ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে বলত, আম্মো বিবেকানন্দ। সভার প্রধান অতিথি বাঁধানো দাঁত খুলে যাওয়ার ভয়ে, দাঁতে দাঁত চেপে বলতেন, আমাদের রবীন্দ্রনাথ, শুধু বাংলার নয়, ভারতের নয়, এশিয়ার নয়, ইউরোপের নয়, সারা বিশ্বের। তিনিই আমাদের শোনালেন মহামন্ত্র। মানুষ মানুষ মানুষ, মানুষকে ভালোবাসো, আমাদের সমস্ত সংকীর্ণতায় জ্বেলে দিলেন মশালে আগুন। আমরা উড়ে গেলুম, পুড়ে গেলুম, তাই তো শুধাই, পঞ্চশরে দগ্ধ করে করেছ এ কী সন্ন্যাসী!

না, পুরীর সাতটা দিনের স্মৃতিতে এর কিছুই ছিল না। এই বিশাল বালুকাবেলা আমাদের, সমুদ্রমহান আমাদের, সব ঢেউ, সব ফেনা, রংবেরং-এর ঝিনুক যত কুড়োতে পেরেছি, আকাশের যতটা নিতে পারা যায়, সূর্যোদয় আমাদের, সূর্যাস্ত আমাদের, রাতের তারা, ঢেউয়ের শব্দ। এর কোনো ঠিকানাতেই এমন কোনো লোক বসেছিল না, যে বলতে পারত, অ্যায়! ইধার আও! তোমার ভ্যালুয়েশন সাড়ে সাতশো টাকা। সুন্দরী স্ত্রীকে নিয়ে সমুদ্র দেখার অধিকার তোমার নেই। তুমি কি এক গেলাস ফলের রস খেয়ে প্রাতভ্রমণে যাও! ক্লোজড ডোর মিটিং-এ তুমি কি কোনো কোম্পানির ভাগ্য নির্ধারণের অংশীদার! তোমার কী এক কেজি মাংসখেকো হুমদো কুকুর আছে?

তোমার সামনে দাঁড়িয়ে হাত কচলে কেউ স্যার বলে? একটা মানুষকে টোস্ট কিংবা রোস্ট করার ক্ষমতা কি তোমার আছে? যাও, সমুদ্র নয়, নর্দমা দেখ গে যাও।

সাতটা দিনের স্বাধীনতা। মানুষ হিসেবে কোন ক্যাটিগোরিতে পড়ছি, সে বিচার নেই। কোনো কাজের কোনো কৈফিয়ত কারোকে দিতে হবে না। সমুদ্র সৈকত ধরে তনুশ্রী ছুটছে চক্রতীর্থের দিকে, পেছনে আমি। কেউ বলার নেই, এটা অসভ্যতা। হঠাৎ পাশাপাশি বসে পড়া। শুনে শেখা গানের একটা দুটো লাইন কোরাসে, এই বালুকাবেলায় আমি লিখেছিনু, একটি সে নাম আমি লিখেছিনু। বসে থাকতে থাকতে সমুদ্রের নোনা বাতাসে তনুশ্রীর গা চটচটে হয়ে উঠত। চিরদিনের কথা ভেবে মনে দুঃখ জমত। জানালার গরাদ ধরে এসে দাঁড়াতো ছেলেবেলা। অনন্তের গায়ে অন্ধকার সমুদ্রের ফসফরাস নৃত্য দেখতে দেখতে একদিন যে চলে যেতে হবে, এই বিষণ্ণতা আসত। আমি হঠাৎ তনুশ্রীর হাত চেপে ধরতুম। যেন যেতে নাহি দিব। আমাদের মধ্যে তখন এইসব কথা হতো, তনুশ্রী ঢেউয়ের ওপর দিয়ে কথা বললে,

—কী হল কী তোমার! ভয় করছে!

—ভয় নয়, আমরা ফুরিয়ে যাচ্ছি।

কাঁচা বয়সের শেলি, কিটস, ব্রাউনিং পড়া বাঙালিবা পাশে মহিলা থাকলে এইরকম ন্যাকা ন্যাকা কথা বলতে ভালোবাসে। চলে যাওয়া সময়ের কথা। জীবনের নশ্বরতার কথা। প্রকৃতির চিরবিদ্যামানতার কথা। এই যেদিন রব না পাশে, ডাকিব না প্রিয়তম। যদিও পোড়ানো হবে, তবুও বলব, শূন্য সমাধি মোর ঢেকে দিও ফুলদলে। চার চৌকো পাথরের বেদি বড়ো রোমান্টিক। অভিমানের আধার। প্রেমের ঝরাপাতা, বিরহের জলে প্যাচপ্যাচে। হাতুড়ি পিটে যাদের খেতে হয় না, তাদের কথাবার্তা এই রকমই, ললিপপ মার্কা। মদের মতো এইসব কথার কিক আছে।

তনুশ্রী আমার কাঁধে হাত, পিঠে মাথা রেখে বলেছিল, ভয় কী, আমরা দুজনে তো একসঙ্গেই ফুরোচ্ছি। আমরা দু-জনে একসঙ্গে হাঁটতে হাঁটতে চলে যাব। সমুদ্রের ওইখানে, এই জায়গাটায় আমাদের বসে থাকাটা পড়ে থাকবে। অন্য কেউ এসে বসবে। আবার অন্য কেউ।

খুব বড়ো মাপের কথা বলার প্রতিভা আমাদের ছিল না। সে থাকলে তো কতো কথাই করতুম। প্রথম শীতে গায়ে কাঁথা, জমাট শীতে লেপ, পোস্তর বাটি চচ্চড়ি, পুঁইশাকের ছ্যাঁচড়া, চুনো মাছের ঝাল, এই তো জীবনের বহর। সে আর ব্ল্যাকহোলের মতো সর্বগ্রাসী কথা বলে কী করে!

তনু অবশ্য সলিড কথা থেকে লিকুইড কথায় চলে গিয়েছিল। কান্না। কাঁদছ কেন?

—এমনি, ভালো লাগছে।

এই সিচুয়েশনে একটা গানের প্রয়োজন ছিল। বাঙালির প্রেমিক ছেলে, একদিকে ভুসভুসে বালি, সামনে ধপাস ধপাস অন্ধকার সমুদ্র, পিঠে একটা নরম রোদভরা প্রাণী, এই সব উপাদানের মধ্যে বসে একটা রবীন্দ্রসংগীত সামান্য ভুল সুরে গাইবে না! এমন ব্যতিক্রম তো হতে পারে না। বেশ গলা হাঁকিয়ে ধরে ফেললুম। বেশ গলা হাঁকিয়ে ধরে ফেললুম। বেশ উপযোগী একটি গান—

কাঁদালে তুমি মোরে ভালোবাসারই ঘায়ে
নিবিড় বেদনাতে পুলক লাগে গায়ে...

সঙ্গে সঙ্গে তনুও কুঁই কুঁই করে উঠল।

তোমার অভিসারে যাব অগম পারে
চলিতে পথে পথে বাজুক ব্যথ্যা পায়ে...

হাত সাতেক দূরে অন্ধকার থেকে একজোড়া গলা বলে উঠল, বলিহারি, বলিহারি। চার গলায় গান যে হল,

পরানে বাজে বাঁশি, নয়নে বহে ধারা
দুখের মাধুরীতে করিল দিশাহারা।
সকলই নিবে কেড়ে, দিবে না তবু ছেড়ে
মন সরে না যেতে, ফেলিলে একি দায়ে...

এই, সকলই নিবে কেড়ে-তে এসে আর পারা গেল না। গলা ভারাক্রান্ত। গলা ভারাক্রান্ত। দু-চারবার হ্যাঁচকা হেঁচকি। অসম্ভব হল কান্না চাপা। রবীন্দ্রনাথ জানতেন কোথায় মোচড় মারতে হয়। চার গলাতেই কান্না—সকলই নিবে কেড়ে। ঢেউ আসছে, ফেনা কেটে সরে যাচ্ছে। ফেনা ফাটার ফিট ফিট শব্দ। রেণু রেণু জলের স্পর্শ। গানটা চলছে। চার ফেরতা, প্যাঁচ ফেরতা। থামানো যাচ্ছে না।

স্বর্গদ্বারের শেষ মাথার সেই দোকানের ঝাঁক। সেখানে স্বপ্ন বিক্রি হয়। একপাশে অন্ধকার সমুদ্র ফুঁসছে, অন্যপাশে আলোকমালায় সজ্জিত দোকান পাট, হোটেল। সবাই অভ্যস্ত জীবনের গুটি কেটে বেরিয়ে এসেছে রঙিন প্রজাপতির মতো। আমি পেছন থেকে দেখছি, আজও দেখছি, কাউন্টারের সামনে ঝুঁকে আছে তনু, পরে আছে সিল্কের শাড়ি। দেহের মসৃণ নিম্নভাগ মৎস্যকুমারীর মতো, স্থির একটা ছন্দ। বড়ো আলো, ছোটো আলো, নানা আলোয় ঝলমলে দোকান। ফর্সা ঘাড়ের কাছে সরু সোনালি হারের চিকিমিকি।

দৃশ্যটা একজন মানুষকে অনেক দূর ভাসিয়ে নিয়ে যেতে পারে। ঝিনুকের নানারকম হার, দুল তুলে তুলে দেখছে তনু। এটা দেখছে, ওটা দেখছে। গলায় পরছে, খুলছে। আমাকে দেখাচ্ছে, মতামত নিচ্ছে। আঁচল সরিয়ে নীল বুকের ওপর ঝিনুকের লকেট ভাসিয়ে একমুখ হেসে বলছে, কেমন! আবার দাম শুনে থমকে গিয়ে করুণ মুখে আমার দিকে চাইছে। দেখছে, একটা বন্দি লোক। দু-হাতে অদৃশ্য হাতকড়া। খরচ করার অঢেল স্বাধীনতা এই লোকটার নেই। সেই আধমোটা, নারকোলে কুলের মতো মাথা, সেই আমার কারারক্ষী সেনগুপ্তের ছায়া আমাদের দু-জনকে ঘিরে আছে। সুখ, সখ, আহ্লাদ, সব তার নিয়ন্ত্রণে। তুমি কতটা খাবে, কী পরবে, কেমন পরবে, সবই তার কৃপা।

তবু আমি বলছি, তোমার যদি পছন্দ হয়ে থাকে তুমি নাও, দামের কথা ভেবো না।

কথাটা বলতে বলতে মনে হয়েছিল, রিচার্ড বাটন এলিজাবেথ টেলরকে বলছেন, ডার্লিং, ইফ দ্যাট প্লিজেস ইউ টেক দ্যাট ডায়মন্ড নেকলেস। নাথিং ইজ প্রেশাস দ্যান ইয়োর আইভরি নেক।

মনে আছে, এরপর আমরা কিছু কটকি গামছা কিনেছিলুম, জামদানি কেনার আনন্দে। সেই রাতে হোটেলের মেঝেতে পা ছড়িয়ে বসেছিল তনু। নীল কোলের ওপর সমুদ্র থেকে কুড়িয়ে পাওয়া যত ঝিনুক, দোকান থেকে কেনা যত ঝিনুকের গয়না। আলিবাবার মাঝরাতে মোহর গোনার মতো দৃশ্য। খুশিতে মুখ উপচে পড়ছে। কত কত দেখ কত ঝিনুক। সব আমি কুড়িয়েছি।

আমি যে তখন অঘ্রাণ মাসের মুলোর মতো তরতাজা। তনু লকলকে পালং। আমি একটু একটু করে তার দিকে এগোচ্ছি। একটা সাপ খেলা করছে পিঠের দিকে। তনুর ঘাড় বেয়ে, পিঠের ঢাল বেয়ে আমার নাক নামছে। ঠোঁট দুটো ত্বক ছুঁয়ে যাচ্ছে। ক্রমশ কোমরে। বেড় দিয়ে শরীরের সামনের দেয়াল ধরে ওপরে উঠছে। নরম দুটি ফল। মখমলের মতো গিরিপথ। খসখসের মৃদু গন্ধ। পাখির ঠোঁট ফল ঠোকরাবে। ক্রমশই বর্বরতা বাড়ছে। ডানার ঝাপট মারছে পাখি। রাতের জোয়ার এসেছে সমুদ্রে। গর্জন ভীষণ। ছেঁড়া আকাশে তারার চুরমার। নুনের গন্ধ। কিরকিরে বালি। জঘনের স্বাদ। ছড়ানো ঝিনুক। এনামেলের শব্দ। কোনো কথা নেই। শুধু শ্বাসের হাপর। ছাড়ানো চুলে ফোটা গন্ধরাজ মুখ। কপালে কেঁপে যাওয়া টিপ। আবেগে আধবোজা চোখ। ফসফরাসের ভাস্কর্য।

অনেক অনেক পরে ছড়ানো ঝিনুকের মাঝে উঠে বসল তনুশ্রী। ঘামে ভেজা পিঠ। কপালে চুল নেমে এসেছে। গড়ুরের ছিন্নভিন্ন ডানার মতো সাজপোশাক চারপাশে ছড়ানো। লজ্জা নিয়ে একপাশে বসে আছি। ঝড় চলে

যাওয়ার পর ভাঙা বোতলের উপলব্ধির মতো। তনু সেই অনাবৃত অবস্থাতেই আবার ঝাঁপিয়ে পড়ল আমার শরীরে। জীবন্ত আবেগ।

হোটেলের সামনে স্বর্গদ্বারের পথ নির্জন। ঘুমিয়ে পড়েছে সব দোকান। বাতাসের বালি নিয়ে খেলা। সমুদ্রের ঢেউয়ে শঙ্খের গর্জন। উদ্বেল কুরুক্ষেত্র। ঢেউ সব পাণ্ডব ও কৌরবপক্ষীয় সৈন্য সামন্ত। মহারথীরা সব শাঁখ বাজাচ্ছেন। পাঞ্জজন্যং হৃষিকেশো দেবদত্তং ধনঞ্জয়ঃ। শ্রীকৃষ্ণের পাঞ্জজন্য, অর্জুনের দেবদত্ত, ভীমের পৌন্ড্র, যুধিষ্ঠিরের অনন্তবিজয়, নকুলের সুঘোষ, সহদেবের মণিপুষ্পক। সমুদ্র থেকে একের পর এক সেই শাঁখের শব্দ।

সব ঝিনুক একে একে কুড়িয়ে একটা বেতের ঝাঁপিতে রাখা হল। ঝিনুকের গয়না আর একটায়। শুয়ে কী হবে! রাতের পর কতটুকুই বা পড়ে আছে তলানি। সমুদ্রের সামনের রাস্তায় নেমে এলুম আমরা দু-জনে। যতটা পারা যায় ভোগ করে নাও। দুঃখ কষ্ট অভাব অভিযোগ চাবুক আছে, থাকবে, থাক। এরই মধ্যে থেকে আনন্দটা নিংড়ে নিতে হবে। কয়েক ফোঁটা যা পাওয়া যায়। তনু আর আমি হাত ধরাধরি করে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে হাঁটছি। রাজবাড়ির দালানে, চার-পাঁচটা লোক আপাদমস্তক মুড়ি দিয়ে শুয়ে আছে। আমরা হাত দুলিয়ে দুলিয়ে হাঁটছি। পুলিস চৌকির পাশ দিয়ে সমুদ্রকে ডান দিকে রেখে। হঠাৎ তনু বললে, তোমার খিদে পাচ্ছে না!

তনু এই ভাবেই কথা বলত, আমার খিদে পেয়েছে, আমার ঘুম পেয়েছে, বলবে না।

এক কাপ চা, কিছু খাবার পেলে মন্দ হতো না। তেমন কোনো ব্যবস্থাই ছিল না। মাঝরাতের বাতাস ছাড়া আর কী পাওয়া যাবে! আমরা আরো অনেক দূরে যেতে পারতুম। টহলদার পুলিস বললে, হোটেলে ফিরে যাও। কিছু খারাপ লোক এই সময় ঘুরে বেড়ায়।

জীবনের সমস্ত বালি চালুনি দিয়ে চালতে চালতে এইরকম দু-একটা সোনার কুচি চকচক করে ওঠে। খুব পয়সাতেই যে খুব সুখ এমন কথা আর বলতে পারব না। আমাদের পুরনো বাড়ির টিনের চালের রান্নাঘর থেকে বর্ষার বোদা সকালে ভারী আকাশের দিকে যখন ইলবিলি করে কয়লার উনুনের ধোঁয়া উঠত, তখন ভাঙা বারান্দায় দাঁড়িয়ে দাঁত মাজতে মাজতে দেখতুম, ছোট্ট মানুষের ছোটো সুখ। একটা নতুন দিনের আরতি। পাহাড়ি কম্বলের উষ্ণতায় ছেয়ে যেত মন। যা আছে তাই দিয়েই তনু রাঁধবে তরিবাদি। চাকি বেলনের ঠকাস ঠকাস শব্দ। গরম রুটির খসখসে গন্ধ। আলুর তরকারি। টিফিন কৌটো রেডি। নটার সময় দৌড়বে ছোকরা। দরজায় দাঁড়িয়ে হাসি মুখে দুর্গা দুর্গা। দেরি কোরো না। ছাতাটা হারিয়ে এস না। পারলে একটু চা এনো। আজ একজোড়া বর্ষার জুতো কিনবে। কিনবেই কিনবে।

মস্তবড়ো পৃথিবী। কোটি কোটি মানুষ। বিশাল হিমালয়। বিপুল নায়াগ্রা ফসল, বিশ্রী রকমের বড়ো লোক রকফেলার, ভয়ঙ্কর মাথা আইনস্টাইন, বিধ্বংসী অ্যাটম বোমা, সনি লিস্টনের ঘুসি, জাপানি সামুরাই, রানি এলিজাবেথ, সুন্দরী মেরিলিন, সুপ্রিম কোর্টের চিফ জাস্টিস, হোয়াইট হাউস, তারই মাঝে অখ্যাত পাড়ায় অজ্ঞাত একটা লোক। আকাশের অনেক নীচে। হাজার তিরিশ ইটে গাঁথা একটুকরো বাড়ি। শ্যাওলাধরা ছোট্ট একটা উঠোন। কলঘর। টিনের দরজা খোলে দড়াম শব্দে। শিকলের ঝনাৎকার। হ্যান্ডপাম্পের ঢকং ঢকং। এপাশ থেকে ওপাশ তার। ঝোলা লাল গামছা, আটপৌরে শাড়ি। বল সাবান। ক্ষার ফোটাবার লোহার কড়া, কয়লা ভাঙার হাতুড়ি। টবে টবে গোটা কতক রিকেটি গাছ। ফুলের আশা! ভাঁজ করা বস্তার পাপোশ। আনাজের ঝুড়ি, আঁশ আর নিরামিশ দু-ধরনের বঁটি। মা লক্ষ্মীর পট, লক্ষ্মীর ঝাঁপি। খোবলা মতো একটা মেনি বেড়াল। ছোট্ট একটা টেবল। পৃথিবীর লাখ লাখ কিউবিক ফুটে কাঠের মাত্র কয়েক কিউবিক ফুটে তৈরি। তার ওপর ছোট্ট একটা আয়না। কোটি মুখের একটা মুখ। ছোট্ট বুরুশ, সাবানের ফ্যানার দলা। দাড়ি চাঁচা। এতটুকু একটা ব্যাগ বগলে খাঁচার দরজা খুলে বাজারে। বিশাল হল আতঙ্কের, ভয়ের। সেটাকে যত ছোটো করা যায় ততই সুখের। দুটো প্রাণীর ভাব ভালোবাসা। গায়ে গা লাগিয়ে বসা। দেহের উত্তাপ। মন থেকে মনে সেতু নির্মাণ। সাগর বন্ধনের চেয়ে আনন্দের। তুচ্ছ কিছু কথা। ঘটি, বাটি, গামলার সুখ। ঘোড়ার পিঠে তরোয়াল হাতে রাজ্য জয়ের স্বপ্ন নয়, একটা তোলা উনুনের স্বপ্ন।

দোর তাড়া বন্ধ করে। হেঁশেল টেঁসেল গোছগাছ করে। আলো নিবিয়ে, টুক করে পা তুলে মশারিতে ঢুকে পড়া। খোঁপাটা আলগা করে বালিশে মাথা। দিনের যুদ্ধ শেষ। রাতের বিরাম। ডায়েরিতে লিখে রাখার মতো কোনো দিন নয়। অনেক দিনের একটা দিন। সকালে পড়ে থাকবে আলোর গায়ে আছাড় খাওয়া মরা বাদুলে পোকার মতো।

একটা হাত বুকে এসে পড়বে। ভারী একটা পা চেপে আসবে তলপেটে। ঘাড়ের কাছে গরম নিঃশ্বাস। ঘনিষ্টতার সুখ। মাথার ছাত, চারপাশের দেয়াল সরিয়ে দিলেই বড়ো অসহায়। মানুষের বর্ণমালার ছেঁড়া দুটো অক্ষর, ক আর খ। হা হা আকাশের তলায় কুচো চিংড়ি। এই সংকীর্ণতাতেই মহতের স্বপ্ন। এই সময় জড়াজড়ি করে যত আশা আকাঙ্খার মালা গাঁথা। দু-চারটে হাই টান শরীর ক্রমে শিথিল। কথা জড়াতে জড়াতে এক সময় তলিয়ে যাওয়া ডুব সাঁতার। যেখানে থাকা সেইখানেই থাকা। যায় না কোথাও। শুধু দিনটা মাড়িয়ে চলে যায়। বোঝাও যায় না, মৃত্যুর দিকে আরো এগিয়ে যাওয়া গেল।

লিভার, পিলে, ফুসফুস আরো সেকেন্ডহ্যান্ড হয়ে গেল।

তনু জিজ্ঞেস করলে,—তোমার পকেটের খবর কী?

—কেন বলো তো! সেই কানের দুল?

—ধুস, দুল কী হবে! আমাকে একটা ভালো ঢালাই করা তোলা উনুন কিনে দেবে! কাগজে বিজ্ঞাপন দেখছিলুম। বেশ অনেকদিন টিকবে। ভালো আঁচ হবে। সহজে ধরবে, কম কয়লা লাগবে। এই বালতির উনুন একেবারে টেঁকে না।

—এই তোমার চাহিদা! কালই আমার সঙ্গে চলো। কিনে দেবো।

—খুব বেশি দাম হলে কিনব না! সামনে অনেক খরচ।

তনু তখন মা হতে চলেছে। সেই যে সমুদ্র, সেই যে ফেনা, সেই যে ঝিনুক সেই যে রাত। আমাদের সন্তান আসছে। শ্রীক্ষেত্রের দান।

—কত আর দাম হবে। চলো না দেখাই যাক।

একটা বড়ো কিছু হতে চলেছে, সেই আনন্দে তনু আমাকে পাশ বালিশ করে ফেলল। শরীরটা ভারী হয়েছে। মধ্যভাগের স্ফীতিতে ঘনিষ্ঠতার ব্যবধান বেড়েছে। আমার আর তনুর মাঝে আর একটা প্রাণ। শরীরের আড়ালে টলটল করছে, তালশাঁসের মতো। আনন্দ হচ্ছে, উদ্বেগ। আবার এও মনে হচ্ছে যাঃ তনু মা হয়ে গেল।

কানের কাছে মুখ এনে লাজুক গলায় বললে, হ্যাঁগো বাজারে পেয়ারা উঠেছে? বেশ ডাঁসা ডাঁসা।

—উঠেছে।

—পয়সা কুলোলে আনবে? খুব খাই খাই বেড়েছে। ঝাল ঝাল চানাচুর, লেবুর আচার। মনে হয়, এটা ছেলে। তনুর শ্বাসে দুধের গন্ধ লেগেছে। ত্বক খুব তেল তেলে হয়েছে। তনু আর প্রেমিকা রইল না। সংসারে ঢুকে গেল। ক্লান্ত তৃপ্ত। ঘুমিয়ে পড়ল। আমার সঙ্গে মাছের মতো খেলা করার ক্ষমতা নেই।

একটা উনুন, ডাঁসা পেয়ারা, আচার, চানাচুর, এই চাহিদা। এই খাঁচার এই দুই প্রাণীর এই হল জগৎ। একটু আগে রাশিয়ার নভোচারী ইউরি গ্যাগারিন, তাঁর নভোয়ান থেকে বেরিয়ে মহাকাশের নিরালম্ব ভাসমানতায় বিচরণ করে বিশ্বমানবকে স্তম্ভিত করে দিয়েছেন। মহাকাশে মানবের জয়যাত্রার সূচনা। আবার ওদিকে পূর্ব ও পশ্চিমকে আলাদা করতে বার্লিনে পাঁচিল তুলেছে কমিউনিস্টরা। কমিউনিস্ট-খপ্পর থেকে মানুষ যাতে পশ্চিমের ধনতন্ত্রে প্রাচুর্যে, ভোগে, উন্নত জীবনে না পালাতে পারে। হো চি মিন-এর ভিয়েতনামে ভয়ঙ্কর যুদ্ধের মেঘ ঘনিয়ে আসছে। বিলাসবহুল ওরিয়েন্ট এক্সপ্রেস বন্ধ হয়ে গেল। আমাদের বাজারে মাছের দাম কমছে না। চিনের সঙ্গে সম্পর্ক ঘোলাটে হচ্ছে। কাশ্মীর নিয়ে ধুন্ধুমার। আমি মশারির ভেতর, আমার পাশে তনু। ঘুমে

অচৈতন্য। ছোট্ট কপালে সিঁদুরের টিপ। ঠোঁটের কোণে হাসি কাঁপছে। স্বপ্ন দেখছে কোনো। ভীষণ সবুজ একটা মাঠ, নীলের চেয়েও নীল আকাশ। দিগন্তের দিক থেকে একটি শিশু টলমলে পায়ে সামনে দু-হাত তুলে হেলে দুলে ছুটে আসছে। সবকালের সব মানুষই এই ভাবে প্রবেশ করে। হো চি মিন, গ্যাগারিন, কেনেডি, দ্য গল, রাসেল, আইনস্টাইন। আসবে, তারা হাজারে হাজারে কাতারে কাতারে আসবে। বর্ষার গঙ্গায় চিতি কাঁকড়ার মতো। কেউ চাপা পড়বে, কেউ যুদ্ধে মরবে। কিছু বিপ্লবে নাচতে গিয়ে শহিদ হবে, কেউ শুধু প্রাণধারণ করবে, কাঁধে করে কারোকে গদিকে বসানো হবে, কেউ মালিক হবে, কেউ মজুর, আবার কেউ কেউ হবে স্ট্যাচু।

খুব সাবধানে ভয়ে ভয়ে তনুর পেটে কান ঠেকালুম। কী রে ব্যাটা। কে এলি। কী করছিস ওই অন্ধকারে। থই থই জল। আর এক শঙ্করাচার্য, না কী শ্রীচৈতন্য, গৌতম বুদ্ধ, বলরাম, বাসুদেব। শোনো বৎস, বড়ো অভাবের সংসার। তোমার মায়ের সাকুল্যে সাতখানা শাড়ি। সোনা-দানা তেমন নেই। মাছ, মাংস, ডিম স্বপ্ন। টিনের দুধের দাম বেড়েছে। রোজগারের ক্ষমতা আমার তেমন নেই। সবাই বলে মাথামোটা। তোমার মায়ের মাথা খুব ভালো। চাকরির বাজারে নামলে সংসার সম্পদে ভেসে যেত। এখন ভেতরে ভেসে ভেসে মায়ের মাথাটি নেওয়ার চেষ্টা করো, আর তোমার ঠাকুরদার আদর্শের উত্তরাধিকার। আমরা পার্টনারশিপে তোমাকে এনেছি বটে, তবে আমি হলুম স্লিপিং পার্টনার। আমার কোনো কিছু নেওয়ার চেষ্টা কোরো না। তাহলেই বিপদ। তাহলে নীল আকাশ তোমাকে পাগল করবে, চাঁদের আলোয় ঝিরিঝিরি গাছের পাতা দেখে রবীন্দ্রসংগীত গাইতে ইচ্ছে করবে, পাখিদের জটলায় সময় ভাসিয়ে দেবে। একতাল মাটি নিয়ে মূর্তি গড়তে বসবে, বৃদ্ধার কাছে গিয়ে পুরনো দিনের গল্প শুনতে চাইবে, কোনো দরবেশের পেছন পেছন অকারণে অনেকটা পথ চলে যাবে। নদীর গান শুনতে ইচ্ছে করবে, মানুষকে ভালোবাসতে ইচ্ছে করবে। মন্দিরে গিয়ে আরতি দেখতে ইচ্ছে করবে। প্রেম করতে ইচ্ছে করবে। এমন সব কাণ্ড তুমি করতে থাকবে যার ফলে নুন আনতে পান্তা ফুরোবে। অভাব, অপমান, উদ্বেগ। সকলের পৃথিবী তোমাকে চাপা দিয়ে চলে যাবে। ভোগ করতে পারবে না। কিছুই দর্শক হয়ে জীবন কাটাবে। ধূর্ত হও, শঠ হও, নিষ্ঠুর হও, হৃদয়হীন হও, স্বার্থপর হও, বেইমান হও। পৃথিবীটা শয়তানের।

ওই সময়টা শুয়ে শুয়ে প্রায়ই আমাদের এই রকম কথা হতো, ইনকামটা যদি কোনো রকমে আর পাঁচশো টাকা বাড়ত, তাহলে আর আমাদের এত দুশ্চিন্তা থাকত না। মাত্র পাঁচশো টাকা। তনু সংসার চালায়। ফাইনান্স

মিনিস্টারের মতো বাজেট করে। তিনি বছরে একবার করেন, তনু মাসে একবার। কখনো এইটায় ছেঁটে ওইটায় লাগায়, কখনো ওইটা ছেঁটে এইটায়। ছাঁটকাটের কারবার।

প্রায়ই দেখতুম ঠাকুরঘরে চোখ বুজে আছে স্থির হয়ে। ভগবানই ভরসা। অঘটন যদি কেউ ঘটাতে পারেন তিনি ভগবান। গরিবের ভরসা তিনি। মানুষ এইরকমই ভেবে আসছে চিরকাল। বারের উপোস, সন্তোষী মা, সবই চালু হয়ে গেল। কার ক্ষমতা বেশি জনা তো নেই। কামনা তো অনেক, সুসন্তান, রোজগার, সুস্বাস্থ্য, সুগৃহ, মানসম্মান, প্রতিপত্তি। একটু বড়োলোক হতে পারলে মন্দ কী।

সবচেয়ে সস্তার মাতৃসদনে আমাদের প্রথম সন্তানের জন্ম হল। নিঁখুত একটি পুত্র। হাত পা বেশ বড়ো বড়ো। চোখ দুটোও সুন্দর। ফর্সা রঙ। নর্মাল ডেলিভারি। তনু ভোগেনি, তনু ভোগায়নি। কর্মী মেয়েদের এই রকমই হয়। ওই যে রোজ দু-ঘণ্টা ধরে ঘর মুছত, রান্নাবান্না, জল তোলা, ওইটাই তো সেফ ডেলিভারির কারণ মশাই। বিপদ তো অলস বড়োলোকদের।

দুই থেকে আমরা তিন হয়ে গেলুম। তরতর করে বাড়তে লাগল আমাদের সন্তান।

এই সময় অদ্ভুত যে ঘটনাটা ঘটল সেটাও তো বলা দরকার। ক্যারাম খেলার একটা মার আছে, সেটাকে বলে ট্যানজেন্ট। সরাসরি ঘুঁটিটাকে মারা হবে না, একটু কায়দার মার, রিবাউন্ডও আর এক কায়দা। স্ট্রাইকারটা প্রথমে বোর্ডের ধারের কাঠে গিয়ে লাগবে, সেখান থেকে ছিটকে এসে ঘুঁটিটাকে পকেটে পাঠাবে। সেইরকম একটা ঘটনাই ঘটল আমার জীবনে। রিবাউন্ড এফেক্ট। একটি ছেলে আমার কাছে পড়ত। সরলা মেমোরিয়ালের ছাত্র। সে হঠাৎ স্কুল ফাইনালে থার্ড হয়ে গেল। কৃতিত্বটা তারই, আমি নিমিত্ত মাত্র। সেই ছেলেটির পাশাপাশি আমারও খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ল। হবে না কেন, মাস্টারমশাইয়ের ছেলে তো। ওর কোচিং-এর ধরনটাই আলাদা।

আমিও মাস্টারমশাই হয়ে গেলুম। রাস্তায় বেরোলেই, মাস্টারমশাই কেমন আছেন? সৌরভ সাতটা লেটার পেয়েছে। আপনার কোনো তুলনা নেই মাস্টারমশাই। দোকানে গিয়ে দাঁড়ানো মাত্রই, আরে আরে মাস্টারমশাইকে আগে ছেড়ে দে। কী চাই মাস্টারমশাই। টিপঢাপ প্রণামও জুটতে লাগল। বাসে উঠে দাঁড়িয়ে কেউ কেউ বসার জায়গাও দিতে লাগলেন।

নীলাচলে সন্তানলাভ। স্বয়ং জগন্নাথ। তার পরেই বোধহয় এই সৌভাগ্যদয়। তাহলে নাম রাখা নীলাচল। কৈলাস বললে, এই সুযোগ, চেপে ধর, লাইন খুলছে।

লাইন মানে?

লাইন মানে মানুষ ক্রমশ বোকা হচ্ছে। সবাই ভাবছে, ছেলেমেয়ে ডিগ্রি ডিপ্লোমা ডক্টরেট পেয়ে ইউরোপ আমেরিকা যাবে, আই এ এস করবে। যতদিন সাহেবরা ছিল, ততদিন বাংলার কদর ছিল। এখন সব ইংলিশ। কিছু লোকের হাতে পয়সা এসেছে, তারা সাহেব হওয়ার স্বপ্ন দেখছে। এই সুযোগ, মাস্টারমশাইয়ের নামে একটা মডেল, কেজি স্কুল খুলে ফেল, আর একটা কোচিং সেন্টার। তনুকেও কাজে লাগা। ম্যানেজমেন্ট আর প্রচারের দায়িত্ব আমার।

—জায়গা?

—সেটাও আমার দায়িত্ব। শিক্ষা আর স্বাস্থ্য—এর চেয়ে ভালো ব্যবসা আর নেই। কোচিং সেন্টার, নার্সিংহোম।

—শেষ জোচ্চুরি!

—জোচ্চুরি কোথায়! এ অনেকটা ভাঙা বাড়ির দরজা জানালা, মার্বেল পাথর বিক্রি। শিক্ষা প্রতিষ্ঠান দু-দলের মারদাঙ্গায় লাটে উঠেছে, হাসপাতাল পাতালে গেছে। এই ভাঙা আসরে আমরা তবলা বাজাব। টুইঙ্কল, টুইঙ্কল লিটল স্টার, হাউ আই ওয়ান্ডার হোয়াট ইউ আর। বাঙালি বিবি, জেন্টলম্যান। স্টিংকিং মানি অ্যাম্বিশন। এর নাম হল প্যারালাল সিস্টেম। ঝোপ বুঝে মারো কোপ।

—এখানে ওসব চলবে?

—এখানে নয় ম্যান। এতকাল তোমার ভাগ্যসূর্য উত্তরায়ণে ছিল, এইবার দক্ষিনায়ণে যাবে। অর্থাৎ এটা আমার করব সাউথে।

মোটা ছেলে, রোগা ছেলে, ছিঁচকাঁদুনে ছেলে, তেএঁটে ছেলে, একবগ্গা ছেলে, ঘাড় কাত মেয়ে, খ্যাঁতখেঁতে মেয়ে, মুখরা মেয়ে, নীরব মেয়ে, যেখানে যত ছিল সব নিয়ে শুরু হয়ে গেল ইংলিশ মিডিয়াম। কৈলাসের কেরামতি, বিধবা মাইমাকে ভুজুং ভাজং দিয়ে মামার বাড়ির খানিকটা ম্যানেজ করেছিল। মামা নামকরা ডাক্তার ছিলেন। বাড়িটাও বিশাল। খোলামেলা জায়গা অনেকটা। টাকাটাও কৈলাস জোগাড় করেছিল। প্রচারেরও অভাব হয়নি।

তনুর কিন্তু ভালো লাগেনি এইসব। তুমি অন্যায় করছ, মাস্টারমশাই বেঁচে থাকলে তোমাকে ত্যাজ্যপুত্র করতেন। তুমি ব্যবসা ফেঁদেছ। তুমি তাঁর আদর্শ থেকে সরে যাচ্ছ। অভাব আর আদর্শ হাত ধরাধরি করে চলে। কে তোমাকে বড়োলোক হতে বলেছে? আমরা তো বেশ আছি।

লোভ যে আমার ছিল না, তা নয়। মনে হয়েছিল, বাপ ঠাকুরদার আমলের জীবন থেকে বেরিয়ে আসি। ছেলেটাকে মানুষ করি। বিলেত পাঠাই।

সেনগুপ্তর শাসন থেকে বেরিয়ে আসি। মনের মতো একটা বাড়ি করি। সামনে পেছনে বাগান। ঢুকেই সামনের দেয়ালে অয়েলে আঁকা মাস্টারমশাইয়ের ছবি। আমার মায়ের কোনো ছবিই নেই। জানিই না কেমন দেখতে ছিলেন তিনি। কার্পেট মোড়া বসার ঘর। মনের মতো একটা লাইব্রেরি। এই সব যদি হয়ই, মাস্টারমশাইয়ের আত্মা কেন রাগ করবেন।

আমি কৈলাসের মুঠোয় চলে গেলুম। কৈলাস ব্যবসা বোঝে। আমাদের কোচিং সেন্টার ক্রমশ বড়ো হতে লাগল। নোটস আর সাজেসনের খুব নাম হল। কম পড়ে অনেকেই পাশ করতে চায়। ক-জন আর শিক্ষিত হতে চায়। আমাদের কেজি স্কুলের তাক লাগান ভড়ং। ড্রেস, খাতা, বই, ডিসিপ্লিন, মাইনে—সব মিলিয়ে সমীহ করার মতো একটা ব্যাপার।

তনু কিন্তু ক্রমশই দূরে সরতে লাগল। হচ্ছে না, এসব ঠিক হচ্ছে না। সেই আগের তুমি অনেক ভালো ছিলে। কোনো ব্যাখ্যা নেই, কেন ভালো ছিলুম। তখন নাকি আমার অনেক স্বপ্ন ছিল। বোঝাতে পারিনি, স্বপন ভালো, না স্বপ্নকে বাস্তব করাটা ভালো। একটা লোক সারাজীবন চটে শুয়ে রাজা হওয়ার স্বপ্ন দেখবে। সে তো অপদার্থ।

রোজ রাতে তনু কাঁদে। কাঁদছ কেন?

—তোমার মৃত্যু হচ্ছে।

—আমাদের বাড়ি হবে, গাড়ি হবে, মোটা ব্যাংক ব্যালেন্স। বছরে একবার ফাস্ট ক্লাসে চেপে সপরিবারে বিদেশভ্রমণ। তোমাকে সাজাব, তোমাকে খাওয়াব, তোমাকে সুখের সাগরে পদ্মফুলে ভাসাব।

—যদি পার, যদি বাপের ব্যাটা হও, মাস্টারমশাইয়ের মতো হও। কিছু ভালো ছেলেকে পড়াও, জীবন তৈরি করো। না হয় কিছু কমই খেলে। না হয় মোটা কাপড় জামাই পড়লে।

তনুর একই উপদেশ রোজ শুনতে শুনতে নিজেকে ভীষণ অপরাধী মনে হতে লাগল। আমার একটা ভুঁড়ি হয়েছে। মুখের ধারালো ভাবটা কমে এসেছে। ক্রমশ গোল হচ্ছে। দুটো চিবুক হয়েছে। কথাবার্তার ধরণ পাল্টেছে। এমন কিছু লোকের সঙ্গে স্বার্থের খাতিরে মিশতে হচ্ছে যারা অসৎ। না, ভালো হচ্ছে না। সাতশো টাকা নিয়ে আমাদের সেই পুরী ভ্রমণ, সি বিচে সেই দৌড়, সেই ঝিনুক কুড়োনো, সেই ঢালাই উনুন নিয়ে বাড়ি ফেরা, চারটে ডাঁসা পেয়ারা। কোন জীবনটা ভালো ছিল। প্রেম বড়ো, না প্রতিপত্তি বড়ো।

খুব বাঁচা বেঁচে গেলুম। কৈলাসের মাইমা-ই ল্যাংটা মারলেন। কৈলাস আর আমি ছিটকে বেরিয়ে এলুম। কেজি, মন্তেসরি, কোচিং সবই রইল—আমরা রইলুম না। প্রিনসিপ্যাল হয়ে বসলেন প্রফেসর চক্রবর্তী। তিনি স্যুট পরেন,

মুখে বাম্বু চুরুট। কৈলাসের মাইমার বয়কাট চুল, রেগে গেলে বাংলা বলেন, নয় তো ইংলিশ। আমাদের কয়েক হাজার টাকা দিয়ে বিদায় করে দিলেন। কৈলাস ফিরে এল তার পুরনো ছাপাখানায়। আমি বেকার। জগন্নাথস্বামী নয়ন পথগামী ভবতু সে।

—এইবার কী হবে তনু।

—এইবার ঠিক হবে। ছাত্র ছাত্রীর অভাব হবে না। বাড়িতে বসেই শুরু করা যাক।

সকাল বিকেল শুরু হয়ে গেল ছেলে পড়ানো। দেখতে দেখতে কুঠিয়াটা হয়ে উঠল গুরুগৃহ। মাস্টারমশাই। কেউ মাইনে দিতে পারে, কেউ পারে না, কিন্তু ভারি সম্মান। ভবিষ্যতের কারিগর। কষ্ট খুব, কিন্তু খুব সুখ। কিছু কিছু উৎকৃষ্ট ছেলেমেয়েও আসতে লাগল। যাদের শুধু লেখাপড়া নয় জ্ঞানও হবে। পড়াতে গিয়ে নিজের পড়াশোনাও বেড়ে গেল। মাথাটাও খুব গেল। বাড়িতে প্রায় সব সময়েই বিদ্যাচর্চা। লক্ষ্মীর আড়ত থেকে মা সরস্বতীর আখড়া। তনুর এখন এক নয়, অনেক ছেলে।

মাস্টারমশাই যেমন বলতেন, আমিও সেইরকমই বলি, মশাই। এর হবে না। ব্যর্থ চেষ্টা করবেন না। বরং কোনো লাইনে ফেলে দিন। লেখাপড়া মানে শুধুই ডিগ্রি, ডিপ্লোমা নয়, সব শিক্ষাই শিক্ষা। প্লাম্বিং, কার ডাইভিং, ইলেকট্রিশিয়ান। কিছু করে যাতে জীবনে দাঁড়াতে পারে। যা হয় না, তা হয় না। গলা নেই গান, শরীর ভাঙে না নাচ, দেখার চোখ নেই ছবি আঁকা। ভেতরে না থাকলে বাইরে তার প্রকাশ হয় না। স্বামীজির কথা।

পয়সাঅলা অভিভাবকরা রেগে যেতেন। অনেকেই বলতেন দুর্মুখ। ব্যাটার খুব ট্যাক ঠ্যাক কথা। এইভাবেই গোটা কুড়ি ছেলেমেয়ে বেশ ভালো তৈরি হল। বড়ো বড়ো জায়গায় গিয়ে বসল। আদর্শ মানুষ হয় তো সবাই হল না তবে শিক্ষিত.হল। বড়ো জীবনের দিকে চলে গেল। মাস্টারমশাইকে হয়তো মনে রাখলে না, কিন্তু মাস্টারমশাইয়ের মনে তারা রইল।

এই সময়েই তনু বললে, দোতলাটা তোলা যাক। ঘরের দরকার হবে। নিচেটা ড্যাম্প। তোমার ব্রঙ্কাইটিস হয়েছিল। মাঝেমাঝেই তেড়েফুঁড়ে ওঠে। দোতলায় রোদ পাবে। খোলামেলা বাতাস। অনেক দূর দেখা যায়। টাকা কিছু জমাতে পেরেছি টেনেটুনে সংসার চালিয়ে। মনে হয় হয়ে যাবে।

বাড়ি দোতলা হল। একটা মনের মতো বারান্দা। তিনখানা শোবার ঘর। বাথরুম। দুটো বেতের চেয়ার কেনা হল। রাতের দিকে পাশাপাশি দু-জনে বসি। তনুর চুলে পাক ধরেছে। শরীরটা ভারী হয়েছে। আজকাল আগের মতো আর খাটতে পারে না। খাটার অভ্যাসটা অবশ্য যায়নি।

সবাই বলে, আমাকে নাকি আমার বাবার মতো দেখতে হয়ে যাচ্ছে। স্বভাবটা যে তাঁর মতে হচ্ছে সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। লোভ প্রায় চলেই গেছে। কামনা-বাসনা কুঁকড়ে গেছে। চাটুকারিতা সহ্য হয় না। বাইরেটা আর ভালো লাগে না। নিজের ভেতরেই থাকতে ইচ্ছে করে। সব এত পালটে গেছে। এখন কোনো ছেলে একটা লেটার কম পেলে তার বাবা মা এসে চোখ রাঙায়। এটা কী হল মাস্টারমশাই।

বেতের চেয়ারটায় কী আছে কে জানে। বসলেই নানারকম ভাব আসে। কৈলাশ সেদিন বেশ বলেছিল, দ্যাখ, আমরা কীরকম বসে বসে বুড়ো হয়ে গেলুম। কোনো চেষ্টাই করতে হল না। সব কিছুর জন্যে কসরত করতে হয়, বুড়ো হওয়ার জন্যে কিছুই করতে হয় না। খেয়ালই ছিল না, কবে চোখে চশমা উঠল। বাইফোকাল হল। মুখগহ্বরে জিব একদিন আনমনা ঘুরতে ঘুরতে আবিষ্কার করল, তিনটে দাঁত নেই। সিঁড়িভাঙতে গিয়ে হাঁটু একদিন অনুভব করল জল শুকিয়ে এসেছে। পেট একদিন ঘোষণা করল, পরিপাক শক্তি দুর্বল হয়ে এসেছে। গুরুপাক সহ্য হচ্ছে না। ভোরবেলা আর শিস দেওয়া পাখির মতো ফুড়ুৎ করে বিছানা থেকে উড়ে যেতে পারছি না।

Second Childishness and mere oblivion
Sans teeth, Sans eyes, Sans taste,-Sans-everything

কৈলাস বলছে, আবার এসে সেই গোড়া থেকে শুরু করতে হবে, একই নাটক, একই পরিণতি, অন্য নামে, অন্যখানে।

দুই

ফুটো সড়াক করে হড়কে অকেন দূর চলে গেছে। রিপভ্যান উইঙ্কলের যেন ঘুম ভাঙল। সেই অবস্থা আমার। রাস্তার দিকের ঝুল-বারান্দায় বসে থাকি। অবাক হয়ে দেখি, এসব কী! কত পরিবর্তন। রাস্তায় প্রতি পাঁচজনে চারজন রমণী! শাড়ি মধ্যবয়সিদের ভূষণ হলেও তরুণীদের সালোয়ার কামিজ। তরতর করে চলেছে কলেজে, কাজে, কি নাচের স্কুলে। নিছক বেড়াতে, কি রোল কাউন্টারে। অনেকের সঙ্গেই বয়ফ্রেন্ড। বিউটি পার্লারে ছাঁটা চুল, কপালের দুপাশে নিদ্রিত বাদুড়ের ডানার মতো লটরপটর। স্কুটারের পেছনে আলটপকা বসে ফরফর চলেছে। কোনো ভয়ডর নেই। আজকাল কর্তা, গিন্নি দুজনেই রোজগারে বেরোয়। স্ত্রীকে অফিসে ড্রপ করে স্বামী নিজে অফিসে চলে যায়। ফেরার সময় স্ত্রীকে কালেক্ট করে আনে। অনেকে সপ্তাহে একদিন রাঁধে। ফ্রিজে লাট করা থাকে। গরম করে করে সারা সপ্তাহ চলে ফ্রিজ থেকে বার করো আবার ঢোকাও। সবই খাবারের মৃতদেহ। মর্গ থেকে বেরোল। পোস্টমর্টেম হল। খাওয়া তো নয় পোস্টমর্টেম। লাশ আবার চালন করে দেওয়া

হল ঠান্ডি ঘরে। একালের মানুষের সময় কোথায়! এই সংস্কৃতির নাম রেখেছি কোল্ট কালচার, অশ্ব সংস্কৃতি। সবাই ঘোড়া, পিঠে চেপে বসেছে অ্যাম্বিশন। টগরবগর ছুট। দৌড় দৌড়। এই বুঝি আমাকে মেরে বেরিয়ে গেল। মানুষের চোখের দিকে তাকালে অস্থির একটা অন্দরমহলের খবর পড়া যায়। পর্বতারোহীর মতো সবাই দড়ি ধরে ঝুলছে। উপরে উঠতে চাই, টপে, শীর্ষে। সেখানে আছেটা কী! তা জানা নেই।

শয়তান চরিত্রটা কেমন? রাস্তার উঠকো বদমাইশ ছেলের মতো। হাতটা মুঠো করে সামনে ধরে বলছে এই নে, কী আছে বল তো! মনে মনে যখন যা চাই, হাতের মুঠোয় তাই আছে ভাবি। কী আছে রে! হিরে! সোনার ঘড়ি, টাটকা মোহর। যেই হাত খুলল, দেখা গেল কিছুই নেই, ফক্কা। সেই ফক্কার পেছনে ছুটছে। রাজনীতি করি। জনসেবা গণসেবা। জীবন জমিতে পেতে দিয়েছি, কার্পেটের মতো, জনগণের পদতলে। এত ত্যাগ! স্বামীজির বাণী শিকাগোর শতবর্ষে, বীজ থেকে অঙ্কুর হচ্ছে তাহলে! বেটার লেট দ্যান নেভার ওই যে মোড়ের মাথায় বিমানবাবুর বাড়ি। সাতকাঠা জমি। এক ব্যাটা ভাড়াটে বসে আছে চারশো টাকায়। বিমান আছেন দিল্লিতে মেয়ের কাছে। ফিরবে না কোনোদিন। দেশসেবাটা তাহেল কেমন হবে! ভাড়াটেটাকে সপরিবারে পাড়া ছাড়া করো। প্রয়োজন হলে পেটাও। চিনেবাদাম আঙুলের চাপে ভাঙে, আখরোটের জন্য হাতুড়ি। আর প্রয়োজন হলে বউটাকে মোড়ের মাথায় চেপে ধরে, একটু খোলামেলা করে দাও। তাতেও যদি না হয়, একালের ভাষায় বাবুকো বানাও। অ্যায়সা বানাও কী, সারাজীবনের মতো ত্রিভঙ্গ। তারপর জমিবাড়ি দখল করে, গোটা চারেক বহুতল। শ-খানেক ফ্ল্যাট মানে একশো ইনটু আট লাখ। হাফ তো আগেই এসে যাচ্ছে হাতে, অ্যাডভানস। কিছু এদিকে দাও, কিছু ওদিকে দাও, বাকিটা নিজে খাও। মোড়ের মাথায় লোহার পাইপের কারবারি, হার্ডওয়্যার মার্চেন্ট, এম ফিল, পি এইচ ডি, ডি লিট ফিলিট কিছুই নয়। ক্লাস ফোর মুকুন্দ, সাতটা মিষ্টির দোকান, সতেরোটা জার্সি গোরুর মালিক আশু। কাঠের কারবারি পরেশ, এরাই হল ফ্ল্যাটের খদ্দের। পাশবালিশে নোট। সেই নোটের নাম ব্ল্যাকমানি। কর্তা করেন মেল পলিটিকস। গিন্নি করেন ফিমেল পলিটিকস। যুদ্ধক্ষেত্রে যেমন রেডক্রস। যুদ্ধ বন্ধ তো আর করা যায় না। মানুষ, সমাজ, কাল, ইতিহাস, যুদ্ধের কমা, ফুলস্টপ। রেডক্রস কর্মীরা লণ্ঠন হাতে, স্ট্রেটার নিয়ে হতাহতদের সেবায় ব্যস্ত। সেইরকম পলিটিক্যাল রেডক্রস। ওই যে মোড়ের মাথায় মহিলাকে বানানো হল, তার হয়ে কে কথা বলবে! আমার মহেশ্বর নন্দী ভৃঙ্গীসহ একটা কাণ্ড করেছে নারী নির্যাতন।

আবার ওই খালপাড়ের কেলাবের ছেলেরা, সেদিন রাতের দিকে মন খারাপ লাগছিল বলে একটু বেশি খেয়ে ফেলেছিল। একে গরমকাল তাই রক্ত আরো গরম হয়ে গিয়েছিল। আর রক্ত গরম হয়েছিল বলে, তারা চালের টালি সরিয়ে মাঝরাতে ঘরে ঢুকেছিল। তারপর আর কিছুই নয়, সবে মিলে করি কাজ, পণ্ড হতে নাহি লাজ। তা সেই মেয়েটির হয়ে কে আন্দোলন করবে। ফেস্টুন, ব্যানার তৈরিই আছে। যখন যেটা লাগে। রাস্তায় নেমে নগরপরিক্রমা। নগরপরিক্রমা তো মহাপ্রভু শিখিয়েই গেছেন! হরিনাম, রামনাম, গোলে হরিবোল নাম। কিছু উষ্ণ বক্তৃতা। পথ অবরোধ। থানা অবরোধ, স্মারকলিপি পেশ। পুলিস ধরে নিয়ে এল জগাকে। একটা ফোন। আমি বলছি, তোমার যম। কোথায় ট্রান্সফার হওয়ার ইচ্ছে হয়েছে। কুচবিহারে না মাথাভাঙায়। আজ্ঞে স্যার! কানে কম শুনছ নাকি! স্যার গণধর্ষণ! গণ শব্দটা আছে তো! মানেটা কী! গণ মানেই পবিত্র। বুঝতে পারলেন। জগাকে চা, কফি খাইয়ে ঠোঁটের সিগারেটে নিজের লাইটারে আগুন ধরিয়ে, স্যালুট করে ছেড়ে দিন। আর যার কেউ নেই, নিরীহ সেই রকম একটাকে ধরে ফাঁসিয়ে দিন। কর্তব্যপরায়ণ! দোবো মেখলিগাঞ্জে চালান করে। এমন কেস দিয়ে দোবো নিজেই সাসপেন্ড। যন্ত্র আমাদের হাতে। মন্ত্র যেমন পড়াব তেমনি পড়বে।

ঝুল-বারান্দায় বসে বসে দেখি, আকাশ সেই আগের মতোই আছে। বাতাস ধুলো আর ধোঁয়ায় ভারাক্রান্ত হলেও চেনা যায়। যে কটা গছ মাল্টিস্টোরিডের ধাক্কা বাঁচিয়ে আজও আছে, সেই আগের মতোই। কুকুর, বেড়াল, কাক, স্বভাব কিছুই বদলায়নি। ভীষণ রকম বদলে গেছে মানুষ। পুরনো দিনের বড়োলোকরা ধুঁকছে। ফুটিফাটা, পলেস্তারা খসা সাবেককালের বাড়ি। ছাতে জলের ট্যাঙ্ক উল্টে আছে। লোহার খাঁচা মরচে ধরে ঝাঁঝরা। যেন টিবি হয়েছে। কেউ দেখার নেই। হয় কোনো বৃদ্ধ, না হয় কোনো বৃদ্ধা। বসে আছে একা শ্মশান জাগায়ে। নতুন বড়োলোকরা এসেছে। পার্টি করে বড়োলোক, ধান্দা করে বড়োলোক, চিটফান্ডের বড়োলোক, দালালি করে বড়োলোক। যাত্রা করে বড়োলোক, ট্রান্সপোর্টের ব্যবসা, কাটারিং, সুপারমার্কেট দোকান, পলিক্লিনিক, নার্সিংহোম। দু-চাকা, চার চাকা তিন চাকার ছড়াছড়ি। এদের কিশোর, যুবক, যুবতির হাতে কালচারের কন্ট্রোল। এরা যে গান শোনে, সে গান আমার কাছে অর্থহীন শব্দ। এরা যেভাবে চলে ফেরে, কথা বলে, আমাদের কালে সেটাকে বলা হতো অসভ্যতা। এদের মেয়েদের সংক্ষিপ্ত সাজপোশাক আমাদে কালে ছিল গণিকারুচি। ছোটো ছোটো লাল, নীল লজেঞ্চুস মার্কা গাড়ি বেরিয়েছে। পুড়ুৎ পাড়াৎ সামনের রাস্তা দিয়ে ছুটে বেরিয়ে যায়। ভেতরে উদোম গান।

ওলে ওলে, পেয়ার পেয়ার। কার আবার পেট ফেঁপেছে। ভুটুর ভুটুর। এই প্রজন্মের প্রাণীরা দেখছি কয়েকটা জিনিস ভীষণ ভালোবাসছে। গান, খেলা আর পিকনিক। প্রায় সব বাড়ি থেকেই যখন তখন বিকট গান ছিটকে বেরিয়ে আসে। বুক ফাটানো তাল বাদ্যযন্ত্রের শব্দ। যেন স্বজনহারানো কোনো গোরিলা বুক থাবড়াচ্ছে। এ বাড়িতে গান, তো ওই বাড়িতে শাশুড়ি-পুত্রবধূর কাজিয়া। শাশুড়ি-জীবটি সংখ্যায় ক্রমশ কমে আসছে। শহরে আর তেমন চোখে পড়ে না। মনে হয় প্রতিকূল আবহাওয়া দেখে মাইগ্রেট করে অন্য কোথাও সরে গেছে। শ্বশুর অল্পস্বল্প দেখা যায়। এই প্রজন্মশাশুড়ি বিদায়ের মতো শ্বশুর বিদায় করতে পারেনি মনে হয় একটি কারণে, সেটা হল প্রপার্টি। হয়তো বাড়িটা শ্বশুরের নামে। শ্বশুর হল দলিল। তাই প্যান্তাখাঁচা মুখে সকালে এক কাপ চা এগিয়ে দিতে হয়। বুড়োর আবার বাঁচার শখ। হার্ট বার দুয়েক হেঁচকি তুলেছে, চোখে মশারি, শরীরের ফ্রেমটা আছে, মাথা ঝরে গেছে। তিনি এই নরখাদক রাস্তায় মাঝে মধ্যে কেরদানি করে বেরিয়ে আসেন। দশ পা হেঁটেই শরীরটাকে টান টান করে বুকটা চিতিয়ে দেখাতে চান, মরদ এখনো শক্তি ধরে। কী বলো হে! যৌবন মনে হয় এখনো যায়নি! কোথাও বসে আছে পোঁ ধরে। আর ঠিক সেই সময় একালের রোডবাগ, কোম্পানির প্রশ্রয় পাওয়া অটো, ছুঁয়িমুয়ি করে নাচতে নাচতে পাশ দিয়ে প্রায় কানকি মেরে ছুটে গেল। নাতির বয়সি ডনজুয়ান: পাশে পাঁপড়িচুলো মাই লাভ, শার্টিনের সালোয়ারে মোমপালিশ, হেঁকে বলছে, দাদু! ব্যায়াম করছ! কাকে বলছে! সত্তর সালে প্রেসিডেন্সিতে দর্শনের হেড অফ দ্য ডিপার্টমেন্ট ছিলেন। বৃদ্ধ হয়েছেন। যাঁর জীবনদর্শন হল তোমাদের কাছে হারতে চাই না। শেষতক খাড়া থাকতে চাই। কানে কম শোনেন। সেনিলিটি এসে গেছে। ছোকরার ব্যঙ্গ বুঝতে না পেরে মৃদু হাসলেন। ভাবলেন প্রশংসা করছে। যেই এগোতে গেলেন ঘড়ঘড়িয়া স্কুটার। পেছনে ঠ্যাং বাড়ানো আরোহিনী। ক্যাঁৎ লাথি, কেতরে বেরিয়ে গেল। তা, এতো কমের ওপর দিয়ে গেল। যাঁরা এখনো শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের চেয়ারে আছেন তাঁদের কী কম খোঁয়াড়! অধ্যাপক ঘেরাও। সারারাত ছেলেতে মেয়েতে টাকে তবলা বাজিয়ে গেল। বাথরুমে যেতে দিলে না। শেষে ক্যাথিটার দিয়ে চল খালাস। কোথায় কোন কলেজে যেন প্রিন্সিপ্যাল তিন মাস হল ঢুকতেই পারছেন না। কাছাকাছি এলেই দেখমার করে তাড়িয়ে দিচ্ছে।

ঝুল-বারান্দায় বসে এইসব দেখি। বড়োদিন থেকে নিউইয়ার, শুরু হল বাঙালির পিকনিক মরসুম। খোলা ট্রাকে ছেলে আর মেয়েদের পাপুয়া ড্যানস। সিক সিক সিটি। লাউড স্পিকারে হিন্দি গান। আনন্দে জাগিছে সোনার চাঁদেরা।

সারাটা বছর কত কাজ, কত শ্রম, কত সাফল্য, কত উন্নতি, কত কৃতিত্ব। জ্বলজ্বল করে জ্বলছে। এইবার আনন্দ কিছু হবে না! নাচতে নাচতে চলো ডায়মন্ড হারবার, বিষ্টুপুর, ফলতা। পথে ওত পেতে আছে আর একদল। গাড়ির পর গাড়ি থামিয়ে চাঁদা আদায়। চোলি ধরে টানাটানি। ছোরাছুরি হাসপাতাল।

মাঝে মধ্যে কৈলাস এসে আমার পাশে থ্যাবড়া একটা মোড়ায় বসে।

কী বুঝছিস! এইরকম একটা প্রশ্ন কৈলাস করবেই।

বোঝার তো কিছু নেই। দেকার আছে অনেক।

তোর লাক ভালো। পুত্রবধূটি মনের মতো হয়েছে।

মেটিরিয়াল ভালো ছিল, তার ওপর তনুর ট্রেনিং। যাওয়ার আগে তৈরি করে দিয়ে গেছে। তবে ভাই জাতটা তো পুত্রবধূর। সেটা সবসময় মনে রাখাই বুদ্ধিমানের কাজ।

সেই তো মুকেশের গান রাজকাপুরের ঠোঁটে, এ ভাই জেরা দেখকে চলো, আগে ভি দেখো, পিছে ভি।

সহি বাত।

যখন খুশি চা চাইতে পারিস?

না ভাই, সাহসে কুলোয় না। তাছাড়া চক্ষুলজ্জা বলে একটা জিনিস তো আছে! একালের মায়েদের তো দম ফেলার অবকাশ নেই। ডেলি রুটিনটা শুনবি! সকালে সাড়ে পাঁচটার মধ্যেই তেড়েফুঁড়ে উঠল। বাড়িতে যে কাজের ছেলেটা আছে সেটাকে খোঁচা মেরে মেরে তোলা হল। দেহাতি ছেলে। বাংলা বোঝে না। তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কচলাকচলির পরই, বাড়ি কেঁপে উঠল। গানস অফ ন্যাভারোন। মানে পাম্প চালু হল। এরপর চা, নাতনির স্কুলের টিফিন।

কত বয়েস হল! এর মধ্যে স্কুল!

তা হল বইকী, দু-বছর পাঁচমাস। একালে তো আমাদের কালের নিয়ম চলবে না। ইংলিশ মিডিয়াম। এখনই বলে, মে আই গো টু টয়লেট। আবার বলে, প্লিজ দাদাই কাম হিয়ার। আর ঘুরতে ফিরতে সরি তো আছেই। উইকলি পরীক্ষা। তিন কিস্তিতে অ লিখতে শিখেছে। পার্ট বাই পার্ট। প্রথমে গোল্লা। তারপর বাঁক। সব শেষে পাশের পাদানি আর আঁকসি। সেই নাতনিকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে যাবে স্কুলে। ফিরে এসেই রান্নাঘরে। ছেলে বেরোবে। তার আবার রকমারি বেরনো। খবরের কাগজের কাজ তো। মেজাজটাও তেমন সুবিধের নয়।

তোর ছেলে তারও মেজাজ!

আরে এটা কালের ধর্ম। একালের সব ছেলেরই মেজাজ। বুড়োরাও কপি করছে। সেদিন এক লিকপিক বুড়ো ষণ্ডামার্কা এক সাইক্লিস্টকে বলছে, মারব থোবনায় এক ভাট্টা, সবকটা দাঁত মুড়কি হয়ে যাবে। আমাকে বাজারে সেদিন আমার চেয়েও এক বুড়ো বলেছে, বেশি রেলা নিও না। ছতরি খুলে নোবো। এ তোমার যুগধর্ম। তা শোনো, রান্নার ফাঁকেই আবার বেরিয়ে গেল মেয়েকে আনতে। এনেই ঢুকে গেল রান্নাঘরে।

তা তুই কী করিস, এই নিয়ে যাওয়া নিয়ে আসায় একটু সাহায্য করতে পারিস তো।

না ভাই, এই পাকতেড়ে চেহারার বুড়ো ওই স্কুলে গেলে সবাই আর্তনাদ করে উঠবে। সেখানে সব সুন্দরীদের কুম্ভমেলা। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা। আকাশজ্যোতি এম আর ডব্লু এক করে ফেলছে। যত বলা হচ্ছে, এম উলটে গেলে ডব্লু হয়, ডব্লু উলটে গেলে এম, ও ওলটাচ্ছে, কিন্তু ধরতে পারছে না, কোন ওলটে কী হল! অনিরুদ্ধর আরো কেলেঙ্কারি। সে ব্যাঙ হয়ে গেছে। লাফ মেরে ফাইভ থেকে নাইনে চলে যাচ্ছে। ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ, নাইন, টেন। কিছুতেই কিছু করা যাচ্ছে না ভাই। ওর বাবা তো রেগে মায়ের সঙ্গে কথাই বন্ধ করে দিয়েছে। বলছে, কনসেপশানের সময় মা ইনঅ্যাটেনটিভ ছিল। শেষে সাইকোলজিস্ট। দেড়শ টাকা ফি। বললেন, ওর ই-ফিকশেসান। ওই ফাইভের ই-টাই হল কালপ্রিট। ওই ই-টাই নাইনের ই-র দিকে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। তাহলে উপায়! একটা বছর এই চলুক, ওয়ান, টু, থ্রি, ফোর, ফাইভ, সিক্স, সেভেন, এইট, নাইন, টেন। ওর কথা ভাবলে রাত ঘুম হয় না ভাই! আর আমার শ্রমণা। কী যে করব আমি! সুইসাইড করব। কেন কী হল! ক্লাসে ঢুকল। ডেস্কে বসল। ঘাড় কাৎ। যা জিজ্ঞেস করবে, কোনো উত্তর নেই। বোবা। এদিকে মাসে মাসে আশি টাকা। ওর আর বিয়েটিয়ে হবে না। কে বিয়ে করবে মুখ্যুকে! আমার বোনের মেয়েটা শিয়োর আমেরিকা যাবে। শ্রমণার জন্যে শ্রমণার বাবা দায়ী। বাপ ঘাড় কাৎ মেয়েরও ঘাড় কাৎ। কৈলাস ভাই, এই আমার একদিনের অভিজ্ঞতা। দ্বিতীয় দিন আমি আর যেতে চাই না। শিশুদের ওই যন্ত্রণা। শুদ্ধ বাংলায় নিদারুণ নিপীড়ন আর মায়েদের ওই ভয়ঙ্কর উৎকণ্ঠা আমার সহ্য হয় না। আমাদের সেই ইজের পরা ইস্কুলের দিনগুলোর কথা ভাব। তুই আর আমি ক্লাস সেভেনে ভর্তি হয়েছিলুম। বগলে বই খাতা, পায়ে বুট জুতো, ঘাস ছাঁটা চুল, ভয় ভয় দৃষ্টি। শিক্ষকমশাইদের মনে হত বাঘ। হেডমাস্টারমশাই সিংহ।

কৈলাস উপসংহারের দিকে আসতে চাইছে, তাহলে তুই আছিসটা কেমন?

খুব আলতোভাবে আছি। বেশি ভর দিতে পারছি না, যদি ভেঙে যায়।

তার মানে পুত্র, পুত্রবধূকে বিশ্বাস করো না?

ওদের নয়। আমি এই যুগটাকে বিশ্বাস করি না। এ যুগে কেউই কারোকে বিশ্বাস করে ন। বিশ্বাসের মৃত্যু হয়েছে। এ যুগটা কী রকম জানিস। ইংরেজিতে বলি, ট্রাস্ট ইন গড, বাট লক ইয়োর কার। সকালের ওপর আস্থা রেখো। কিন্তু নিজের ওপর আস্থা রাখতে ভুলো না। আর একটা উপদেশ শোন। হোয়েন-ফেসড উইথ এ সিরিয়াস হেলথ প্রবলেম, গেট অ্যাটলিস্ট থ্রি মেডিক্যাল ওপিনিয়নস। বাড়িতে রান্নার গ্যাস থাকলেও কয়লার উনুন বজায় রেখ। ইলেকট্রিক আলো জ্বাললেও মোমবাতি আর দেশলাই হাতের কাছেই যেন থাকে।

কৈলাস বললে, বয়েস হলে মানুষ সিনিক হয়ে যায়। তুই বেশ ভালোই আছিস।

কৈলাস চলে গেল। বোধহয় চা খাওয়ার ইচ্ছে ছিল, তাই চায়ের কথা পেড়েছিল। বিশাল চেহারার মালিক। বহুতল বাড়ির মতো। বড়োলোকের ছেলে। খাওয়াদাওয়ার অভাব ছিল না, আড়াটাও ভালো ছিল, তাই বিশাল। এখন একটু থলথলে। চলে যেতে বারান্দায় যেন একটু আলোবাতাস খেলল।

নাতনির সঙ্গে আমার সময় বেশ ভালোই কাটে। নানা সময়ে আমার নানা চরিত্র। তবে বেশির ভাগ সময়েই আমি রিয়া। সামনের বাড়িতে প্রায় আমার নাতনির বয়সিই একটি মেয়ে থাকে, তার নাম রিয়া। আমার নাতনির নাম পূজা। পূজা তাকে বন্ধু করতে চায়। বারান্দায় দাঁড়িয়ে দু-জনে কথা হয়। রিয়া কিন্তু এ-বাড়িতে আসে না। খুব বড়োলোক বলেই হয়তো তাকে মা-বাবা আসতে দেয় না। আমাকে রিয়ার ভূমিকায় অভিনয় করতে হয়।

ডল পুতুলের মতো ফুটফুটে পূজা ব্যস্তসমস্ত হয়ে এল, কী রে রিয়া, কী করছিস তুই।

এর উত্তরে গলাটা সরু করে কাঁদো কাঁদে ভাবে আমাকে বলতে হবে আর বলিস না ভাই-পূজা, আমাকে না আমার মাম্মি খুব মেরেছে।

পূজা অমনি, ভীষণ উতলা হয়ে জিজ্ঞেস করবে, কেন কেন, তুই কি করেছিলিস রে রিয়া?

আমি না একটা সুন্দর গেলাস ভেঙে ফেলেছি রে পূজা।

গেলাস নিয়ে তুই আবার কী করছিলিস!

ওই যে আমাকে তলপ্যান খেতে দিয়েছিল।

পূজা কমপ্লান বলতে পারে না তলপ্যান বলে। পূজা তখন খুব বিরক্ত হয়ে বলবে,

আঃ তোকে কেন তোর মাম্মি গেলাসে দেয়! ভাঙলি কেন! খুব মেরেছে।

ভীষণ মেরেছে রে!

কই দেখি, দেখি কোথায় লেগেছে।

এই দেখ, এই জায়গাটায়। কী হবে রে পূজা।

কোনো ভয় নেই, আমি তো আছি।

আমাকে আর বাড়িতে ঢুকতে দেবে না রে!

ঠিক আছে তুই আমাদের বাড়িতে আমার কাছে থাকবি।

তোর মাম্মি বকবে।

কিচ্ছু বলবে না। আমার মাম্মি তোকে কিছু বলবে না।

এরপর পূজা একটু গম্ভীর মুখে বলবে, রিয়া! তুই কিন্তু খুব জিনিস ভাঙিস! কেন রে রিয়া!

কী করব বল ভাই পূজা, খুব ইচ্ছে হল হাত দিয়ে দেখি। আর অমনি উলটে গেল। আর ভেঙে গেল। আর আমার মাম্মি এসে দুম দুম করে পেটাল।

কোথায় কোথায়?

এই যে পিঠে।

দেখি দেখি—

পিঠটা দেখে বললে, ও কিচ্ছু হয়নি। আমি ওষুধ দিয়ে দোবো।

আমি কোথায় থাকব রে পূজা! আমার কী হবে!

আমি তো আছি রিয়া। আমি তো আছি।

আমাদের এই খেলায় পূজা মাঝে মাঝে রিয়া হয়, আমি তখন পূজা। সময় সময় সব গুলিয়ে যায়। তখন পূজা জিজ্ঞেস করে, তুমি কে? পূজা না রিয়া! পূজার থুপুর থুপুর পায়ে ওর মা দুটো তোড়া পরিয়ে দিয়েছে। যখন ছোটে ঝুনুর ঝুনুর শব্দ হয়। কপালের ওপর ঝুলে আছে রেশনের মতো চুল কালো হিরের মতো দুটো চোখ। যখন আমার পাশে চিৎ হয়ে ঘুমোয়, মুখে চাঁদের আলো এসে পড়ে। আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবি, পৃথিবীতে শুরুর কোনো শেষ নেই। সব সময়েই শুরু হচ্ছে নতুন জীবন, নতুন পথ চলা। দেখতে দেখতে পূজা বড়ো হবে, আমি আরো বুড়ো হব, আমি বেরোচ্ছি পূজা ঢুকছে। কলেজ, ইউনির্ভাসিটি। সহপাঠী, পড়া কথা, প্রেম, বিবাহ সংসার, আমার জায়গায় আমার ছেলে, আর একটা পূজা, আর একটা রিয়া একই রকমের পুতুল, টিয়া, হাঁস, বাঘ, হনুমান, গাড়ি, কটর কটর বন্দুক। খিল খিল হাসি, অভিমানের কান্না। বিধাতা পুরুষ এ এমন এক গল্প ফেঁদেছেন যার কোনো শেষ নেই। নদী আছে, পাহাড় আছে, গ্রাম আছে, শহর আছে, গাছ আছে, পাখি

আছে, দোলনা আছে, শ্মশান আছে। এসো, খেলা করো চলে যাও। খেলার মাঠ, দু-পাশে দুই গোলপোস্ট। গোল খাও, গোল দাও।

সাড়ে তিনজন মানুষের ছোট্ট এই সংসার! চার পাশে সমস্যার সমুদ্দুর বিশৃঙ্খল, এলোমেলো সমাজ। আমার ভূমিকা দর্শকের। কোনো অভিভাবক আমার কাছে আর ছাত্র-ছাত্রী পাঠাবেন না। আমি ব্যাকডেটেড। আমি ইংরেজি পড়াতে গেলেই আগে নেসফিল্ডের গ্রামার, রো অ্যান্ড ওয়েব, গঙ্গাধর ব্যানার্জি পড়াতে চাইব। ছেলে বলবে, সে আবার কী! এখন ব্যাকরণ ছাড়াই ইংরিজি শেখা যায়। সেই কারণে আমি সম্পূর্ণ বেকার। চোখের জন্যে নিজেও আর বেশি লেখাপড়া করতে পারি না। নয়া জমানার খবরের কাগজ আমাদের জন্যে নয়। হাবোড়-তাবোড় কী যে থাকে। রঙিন পাতার শাড়ি, চুল, ত্বক, রান্না, নায়িকার অবৈধ প্রণয়, মেয়েদের শেকল ছেঁড়ার আন্দোলন বিদেশের লাম্পট্য, স্বদেশের ধর্ষণ, সব মিলিয়ে বাদশাহি দোকানের মাটন চাঁপ, রুমালি রোটি। ভীষণ গুরুপাক।

নাতনিটাই আমার বন্ধু। বললে, ঘোড়া হও। পিঠে চেপে, হ্যাট হ্যাট আবার গান গায়, চল মেরে ঘোড়া হ্যাট-হ্যাট। খুব নাচতে শিখছে। আমাকে নাচ দেখায় ঘুরে ঘুরে। হাতের মুদ্রা, চোখের ভঙ্গি। ভেতরে নাচ আছে। মাঝে মাঝে নাচ পায়। তখন আর তাকে থামানো যায় না। সারা ঘর গোল হয়ে ঘুরবে। দুধ সাদা ফ্রক হাঁসের পেখমের মতো উড়তে থাকবে। একটা বন্দুক আছে, সেইটা দিয়ে গুলির শব্দ করে বলবে, মেরে যাও। আমাকে জিব বের করে উলটে পড়তে হবে। তখন এসে কাতুকুতু দেবে। সঙ্গে সঙ্গে আমি বেঁচে উঠব। পরমুহূর্তেই গুলির শব্দে আবার আমি মরে যাব, আবার কাতুকুতুতে বেঁচে উঠব। পর্যায়ক্রমে এই চলতে থাকবে। ক্লান্ত হয়ে পড়লেও নিষ্কৃতি নেই। মৃত্যুর দৃশ্যে আমার মৃত্যুভাবনা আসবে। সত্যিই তো আর কটা দিন। হয়েই তো এসেছে। এইবার পায়ে পায়ে লকলকে আগুনে গিয়ে শুতে হবে। এক মুঠো ছাই।

মেয়েটাকে তেল মাখাই। চানের পর্বটা বড়ো মধুর। বড়ো একটা বালতিতে বসিয়ে দিতে হবে। আধবালতি জল। নাচানাচি। জল ছেটকাছিটকি। মসৃণ ত্বক জেল্লা দিয়ে উঠবে। মাথার জল মুখ দিয়ে ঝরে পড়ার সময় দম আটকে আসার আতঙ্কে একটু ছটফটানি। তারপর গা মোছানো। মাথা মোছানোর সময় একটু কান্না। পাউডার। পাতলা নীল ফ্রকে মহা খুশি হয়ে নেচে ওঠা বিশাল বিপুল একটা পৃথিবীর মধ্যে কী সামান্য একটা ঘটনা। কিন্তু কী আনন্দের। আমি সেবা করার সুযোগ পাই। মনে পড়ে যায়। তনুর ডান হাতের কনুইয়ের কাছ থেকে

ভাঁজ করে আমাকে পেছন দিকটা দেখাচ্ছে। দেখো কতটা কেটে গেছে খোঁচা লেগে! ফর্সা গোল একটা হাত। লাল রক্ত। পৃথিবীর কারোকে নয়, একমাত্র আমাকেই বলছে। নিয়ে আয় তুলো, নিয়ে আয় আয়োডিন। যত না হয়েছে তার চেয়ে বেশি আমার ব্যস্ততা। অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে আলতো আলতো করে পরিষ্কার করা। একটু একটু আয়োডিনের ছোঁয়া, উ, জ্বালা করছে, বলে সামনে ঝুঁকে পড়া। তখন সেই ঘাড় আলগা খোঁপা, পিঠের অনেকটা অনাবৃত চকচকে অংশ দেখতে পাওয়া। তখন আমার সেবা, আরো সেবা, ফুঁ দেওয়া। জীবন অনেক বড়ো ব্যাপার, যুদ্ধ, অভিযান, আবিষ্কার, বিপ্লব, গিলোটিন, ওয়াটারলু, ট্রাফালগার, কিন্তু এই যে মুক্তোর দানার মতো, ভেতরে, অন্তরে মানুষকে ভালোবাসার একটা শুক্তি খুঁজে পাওয়া, এর কোনো দাম নেই তবু কোহিনুর। এইটুকুর জন্যেই বাঁচা যায়। কিছুই পেলুম না, এইটুকুই পেলুম। আমার লতার প্রথম মুকুল চেয়ে আছে মোর পানে।

পূজা মাঝে মাঝে আমার পুত্রবধূ হয়ে যায়। আমি তখন তার বাবা। আমার পুত্রবধূ আমাকে যা যা বলে পূজাও আমাকে তাই বলে। বাবা, তুমি সেই ঠাণ্ডা জলে চান করছ, তোমার না বুকে সর্দি বসেছে। এক্ষুনি কাশি হবে। একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না! তারপর আমার ছেলেকে ডেকে নালিশ করবে, এই যে শুনছো, তোমার বাবাকে কিছু বলো।

এইরকম সব ছোটোখাটো মজার দিন যাচ্ছে। রাতটাই একটু অন্যরকম। দরজা বন্ধ করলেই উদোম নিঃসঙ্গ। চিৎ হয়ে বিছানায় পড়ে থাকা। এপাশ, ওপাশ। মাথার কাছে খোলা জানালা। এক আকাশ গনগনে তারা। হঠাৎ বয়ে আসা ক্যালেন্ডারের পাতা কাঁপানো বাতাস। অনেক রাতে আকাশ মাঝে মাঝে অট্টহাসি হাসে। হাততালি দেয়। জেগে থাকলে এইসব শোনা যায়। সাপের হিস হিস শব্দ। ছাতে ভারী কিছু পড়ে গড়িয়ে যাওয়ার শব্দ। আগে খুব ভূতের ভয় ছিল, এখন নিজেই ভুত হয়ে গেছি। মানুষের সবচেয়ে বড়ো সঙ্গী তার নিঃসঙ্গতা।

শুয়ে শুয়ে দেখি, জীবনটা কেমন কার্পেটের মতো গুটিয়ে এসেছে। শৈশব, কৈশোর, যৌবন, প্রৌঢ়ত্ব, বার্ধক্য। বেশ মজা লাগে। সময়ের ব্যবধানে ছাড়া ছাড়া নয়। সব এক ঠাঁয়ে এসে জড়ো হয়েছে। তনুর ফেলে যাওয়া অজস্র স্মৃতি। পায়ের দিকে আলমারি ফুলশয্যার রাতে যে সব পোশাক পরেছিল, শাটিনের শায়া, বেনারসি ব্লাউজ, এমনকী বক্ষবন্ধনীটির পর্যন্ত সযত্নে রাখা। সেই রাতের একটি নারী শরীরকে একেবারে নিজের অধিকারে পাওয়ার প্রথম বিস্ময় আজও কাটেনি। হঠাৎ একটা বই শুরু হয়ে যাওয়া। পর্দা সরে গেল।

অজস্র আলো। বাদ্যযন্ত্রীরা আবহ সংগীত বাজাচ্ছে। প্রম্পটার প্রম্পট করছে। নাটক শুরু। দুঃখ, কষ্ট, আনন্দ, দায়িত্ব, রহস্য, রোমাঞ্চ। একটা মেয়েকে ঘিরেই সব তৈরি হয়। জড়িয়ে জড়িয়ে ওঠে। কুঁড়ি, ফুল ফল, পাখি, দিন, রাত গতি। বছর। দিয়ে মাপলে মহাকালের এক পলক। জীবন দিয়ে মাপলে মিসিসিপি, ইয়াংসিকিয়াং।

এই সময় গলার কাছে একটা শব্দ শুনতে পাই। যেন সানাইয়ের সর্দি হয়েছে। বাগেশ্রী, কেদারা কী জয়জয়ন্তী, কী সোহিনী না হয় একটা কিছু ধরতে চাইছে। প্রথমে খুকখুক কেশে হুঁশিয়ারি দিতে চাই, রাত অনেক, এখন বাদ্যবাজনা পাবলিক অ্যালাউ করবে না। অন্তত তোমার বাজনা। তুমি কী লোকাল ক্লাব। ক্লাব ইংরেজি শব্দ। পশ্চিমবাংলার প্রগতিশীল সংস্কৃতিতে উচ্চারণ, কিলাব। কেলাবও হতে পারে। আজকাল এইরকম ভাষা শুনি, গাড়িটা খুব হরেন দিচ্ছিল, কেলাবের মুরারী ডেরাইভারকে ধরে বেধড়ক পিটিয়েছে। ব্যাগি প্যান্ট, জামা, ঘাড় অব্দি ঝুলুর ঝুলুর লক্কা চুল। শারুক খান, সানি দেওল। এই ছেঁচা বেড়ার কেলাব সারা রাত আলমারি-আকৃতির কেলে স্পিকার বক্স দিয়ে গোটা পল্লীটাকে গানে গানে চুবিয়ে দিতে পারে, তুমি পার না।

ছোটো কাশিতে যখন কাজ হয় না, তখন একটা বড়ো মাপের কাশি ছাড়ি। উচিত কাজ নয়, উলটো দিকের ঘরেই পুত্র, পুত্রবধূ, নাতনি। কাশির মতো বিরক্তিকর। কিছুই নেই। বড়ো কাশিতেও উপদ্রব কমে না। সিঁ, সাঁই, সুঁই নানা ধরনের শব্দ। মাঝে মাঝে একঘেয়েমি কাটাবার জন্যে নিজেই একটু কালোয়াতি করি। ছাত্রজীবনের সেই গান মনে পড়ে, জেগে আছি, একা, জেগে আছি কারাগারে। জানালায় ঝকঝকে কালো আকাশ। মাঝে মাঝে উল্কাপাত। প্রহরে প্রহরে পেঁচার ডাক। ফুলশয্যার রাতটা তনুর সঙ্গে, আমি জেগেই কাটিয়েছিলুম। জীবনের যত কথা এক রাতেই বলার চেষ্টা। মনের নাট-বল্টু -পিনিয়ান-গিয়ার-হেয়ার স্প্রিং-ব্যালেন্স হুইল সব খুলে ফেলা। আর এই হাঁপানির সঙ্গে আমার চির ফুলশয্যা। শোয়ার উপায় নেই। শুলেই মনে হয় কংসরাজ বুকে জাঁতা চাপিয়ে মেরে ফেলার চেষ্টা করছে। জল থেকে তোলা কাতলা মাছের মতো খাবি খাওয়া।

জিনিসটা আস্তে আস্তে বাড়তে লাগল। কাশির ঠেলায়-ঘুলঘুলি থেকে চড়াই উড়ে যায়। বিচারে বসল পরিবার। অত্যাচারের ফল। তিনবার চান, ঠান্ডা জলপান ইত্যাদি ব্যভিচারের এই পরিণাম। ডাক্তার এলেন। প্রবীণ এম ডি। বুকে কল বসিয়ে ধমকের সুরে বললেন, টানুন, জোরে টানুন।

শ্বাস টানা মাত্রই, ধমকে ধমকে, গমকে গমকে কাশি। গঙ্গ, সিমব্যাল, স্যাকসোফেন সব একসঙ্গে। হৃদকমলে বড়ো ধুম লেগেছে। মজা দেখিছে

আমার মন পাগলে। প্রবীণ ডাক্তারবাবু বললেন, করেছেন কী মশাই, বুকে যে রাম চৌকি বসিয়ে ফেলেছেন! অ্যান্টিবায়োটিক খেতে হবে। কী খাবেন, দশ, পনেরো, উনিশ, ছাব্বিশ, আটত্রিশ। কোনটা? অসহায়ের মতো ওদের দিকে তাকালুম। রোজগার তো নেই। বোস্ট আর্টিস্ট। দশের কমে কিছু থাকলে ভালো হতো। অনেকটা খেলতে পারে এইরকম ব্রড স্প্রেকট্রাম অ্যান্টিবায়োটিক আর দশের নীচে নেই। মনমোহনবাবু গ্যাট করে সব বাড়িয়ে দিয়েছেন। ডাক্তারবাবু রসিকতা করে বললেন, দশে ক্যাপসুলের খোলসটা হতে পারে। শেষে উনিশে রফা হল। সাতদিন এই চলুক। খুব সাবধান। ঠাণ্ডা যেন একটুও না লাগে। কাঁচা-পাকা জলে চান। পেট ঠেসে খাবেন না। পৃথিবীর প্রোপোরশন, একের চার ভাগে সলিড, তিনের চার ভাগ লিকুইড। রাতের খাওয়াটা সন্ধের একটু পরেই সেরে নিয়ে বেশ খানিক পায়চারি করবেন। হজম করিয়ে শুতে যাবেন। পেট যত খালি রাখবেন ততই রিলিফ।

তিনটে দিন গেল। কথায় আছে, চলছিল রুগির উঠে বসে, কাল হল রুগির বদ্যি এসে। আগে শ্বাস নিলে ফুসফুস তবু চলছিল, যা হয় একটু বাতাস ঢুকেছিল। এখন মনে হচ্ছে দুটো পাথরের টুকরো। বাতাস ধাক্কা খেয়ে ফিরে আসছে।'

কৈলাস বললে, বুড়ো বয়েসে দুম করে অ্যান্টিবায়োটিক কেন খেতে গেলি! সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল।

সাজানো বাগান শুকিয়ে গেল মানে?

পেটে একটা উদ্ভিদের বাগান আছে। সমুদ্রের তলায় যেমন থাকে। ফ্লোরা, ফনা। তাদের কাজ হল এনজাইম-টেনজাইম, হজমি রস সাপ্লাই করা, চড়া কোনো খাবার থেকে পেটের দেয়ালটাকে রক্ষা করা। যেই অ্যান্টিবায়োটিক খেলে, অমনি সেই বাগান শুকোতে লাগল। তোর এখন উচিত, খুব দই খাওয়া। টক দই।

দই খাবা কী রে! আমার তো হাঁপানি।

অ্যাঁ, হাঁপানি কী রে! তোর হাঁপনি হবে কী করে! ফ্যামিলিতে কারো ছিল! বাবা, মা, দাদু, দিদা।

শুনিনি।

তোদের বংশলতিকা নেই।

আছে। রামহরির তিন পুত্র, রাখহরি, বলহরি, হরিহরি। রাখহরির তিন পুত্র এক কন্যা। এইরকম সব আছে। সেই মহাপ্রভুর কাল থেকে। কারো নামের পাশে ব্র্যাকেটে হাঁপানি লেখা নেই।

তাহলে তোর এটা হাঁপনি নয়, অন্য কিছু। একটা সুইমিং কস্ট্যুম কিনে দিনকতক সাঁতার প্র্যাকটিস কর।

কোথায় করব ছাতে, জলের ট্যাঙ্কে। বারাসতের দিকে একটা পুকুর আছে বেশ বড়ো। সেখানে করবি?

ওর চেয়ে মরে যাওয়া ভালো।

তাহলে এক কাজ কর। তপনকে ধরে আনি। যোগাসনের এক্সপার্ট। আসনে এসব ম্যাজিকের মতো সেরে যায়।

পরের দিন তপন এল। খোঁজপাত করে জানা গেল, তপন আমার পিতৃদেবের ছাত্র ছিল। যোগের এখন খুব বাজার। কুঁজোকে সোজা করে, মোটাকে রোগা করে, রোগাকে মোটা।

মেঝেতে কম্বল পাতা হল। তপন ছোট্ট একটা লেকচার দিল। অক্সিজেনের প্রয়োজনীয়তা। সাঁই সাঁই করে শ্বাস নিতে হবে। শ্বাসেই আরাম, শ্বাসারাম। কাকচঞ্চু প্রাণায়াম। সেটা কী। ঠোঁটটাকে সরু করে জিবটাকে রোল করে তেড়ে বাতাস টানুন। গিলে ফেলুন। নাক দিয়ে ছেড়ে দিন। ছত্রিশবার। বাতাস পান করুন।

অনেকক্ষণ ধরে কসরত চলল! ঠোঁট সরু হচ্ছে, কিন্তু জিব গোল হচ্ছে না।

কৈলাস পাশেই ছিল। বললে, পাকা জিব তো, তাই খাল হচ্ছে না। প্র্যাকটিস করতে হবে। মাখম মাখাতে হবে। অভ্যাস করলেই এসে যাবে। ঝাল খেয়ে উস করে বাতাস টানা আর কী!

তিন রকমের প্রাণায়াম করতে হবে। দাঁড়িয়ে, বুকে হাত দিয়ে শ্বাসটানা। খাঁচা যেন সামনের দিকে ঠেলে ওঠে। আর একটা হল, বায়ু সঞ্চালিনী। মাথা বৃত্তাকারে ঘোরাতে ঘোরাতে শ্বাস টানা আর ছাড়া। বেশ ভজঘট ব্যাপার। তাল কেটে যায় থেকে থেকে। এরপর ধনুরাসন, নৌকাসন, সর্বাঙ্গাসন, হলাসন, কম্বলের ওপর বুড়ো বয়সে ধস্তাধস্তি কাণ্ড। শেষে ডাক পড়ল পুত্রবধূর।

আমাকে মেঝেতে উবু হয়ে বসতে হবে। যে ভাবে বাথরুমে বসা হয়। তারপর আমার পুত্রবধূ শিরদাঁড়ার দু-পাশে দুহাতে ধপধপ থাবড়াবে। ওপর থেকে নীচে নীচে থেকে ওপরে। এর নাম মনে হয় সুড়সুড়ি। কে দেবে। আমার পুত্রবধূ।

কৈলাস বললে, ধনুক আর নৌকো আম করে দোবো। শরীরটাকে পেছনে দুমড়ে দেওয়া তো।

তপন বললে, না না, কোনোরকম বলপ্রয়োগ চলবে না। এই বয়েসে খিল খুলে গেলে কেলেংকারি। তপনের মধ্যে বেশ একটা গুরু-গুরু ভাব এসেছে। কথায় কথায় বলল, কয়েক মাস পরেই আমেরিকা চলে যাবে। সেখানে বিরাট

ব্যাপার। হলিউডের চিত্রতারাকারা, মিলিয়ন ডলার টেনিস খেলোয়াড়রা, পপ সিঙ্গাররা যোগের ভক্ত। এখানকার কয়েকজন ওখানে গিয়ে খুব নাম করেছেন। বিপুল বড়োলোক হয়েছেন। এক একজনের তিনটে, চারটে করে রোলসরয়েস। সেই সদভাবনার কথা ভেবেই তপন ঝড়ের আগের আবহাওয়ার মতো গুমোট মেরে গেছে। তপন চলে গেল।

কৈলাস বললে, তাহলে নিয়ম মেনে এগুলো কোরো। অনেক কষ্টে তপনকে ধরে এনেছিলুম। বড়ো বড়ো লোককেও যোগ শেখায়। তোর অনেক ভাগ্য যে এককথায় চলে এল। সেই ভাগ্যটা এখন কাজে লাগা।

নিজে নিজে যা করা যায় চেষ্টা করব। পুত্রবধূর সাহায্য আমি নিতে পারব না। ইজের পরে চিৎ হয়ে পড়ে আছি, পা থেকে মাথা পর্যন্ত সুড়সুড়ি দিচ্ছে, সেনসেশন, উবু হয়ে বসে আছি, পিঠে ধাঁই ধাপ্পড়। এইসব কেলেংকারি আমার দ্বারা হবে না ভাই।

তবে হাঁপিয়ে মরো।

কৈলাস রেগে চলে গেল।

এতক্ষণ পূজা সব দেখছিল। তির তির করে বেরিয়ে এল তার কোণ থেকে। এসেই বললে, তুই রিয়া, না পূজা।

রিয়া।

না, তুমি এখন বাবা।

তার মানে পূজা এখন আমার পুত্রবধূ সুস্মিতার ভূমিকায়।

পূজা তার মায়ের ভঙ্গি অনুকরণ করে বললে, বাবা। শুয়ে পড়ো, শুয়ে পড়ো।

শোবো কেন রে!

সেনচেশন।

ওই প্রক্রিয়াটা খুব ভালো লেগেছে। সুড়সুড়ি।

ও তো হয়ে গেছে পূজা। আবার কাল হবে।

পূজা নয়, আমি ছুম্মি। পূজা নিচে রান্নাঘরে। বাবা! শুয়ে পড়ো, আমি কিন্তু খুব রেগে যাচ্ছি। বাবার শুতে হল। আবার উবু হয়ে বসতে হল। গুটগুটে, ফুটফুটে মেয়েটা কখনো সুড়সুড়ি দেয়, কখনো পিঠের দু-পাশে ছোটো ছোটো হাতে থাপ্পড় মারে। সমানে গান চলেছে। কখনো হুঁ হুঁ করে। কখনো বাণী বসিয়ে। ম্যাও, ম্যাও, ম্যাও, ছোতে ছোতে পা।

কিছুক্ষণের মধ্যেই আমার চরিত্র পালটে গেল। হয়ে গেলুম পূজা। পূজা সুস্মিতাতেই রইল। শুরু হল, আমাকে চান করানোর খেলা। দু-চার ঘা মারও হল, অসভ্যতা করার সাজা।

মারছ কেন মা! আমি কী করেছি!

দাঁতে দাঁত চেপে বললে, কী করেছি কী করেছি। কী করেছিস জানিস না তুই। জল থেকে উঠতে চাইছিস না কেন? সর্দি হবে না। রিয়া তোর চেয়ে অনেক সভ্য। রিয়াকে দেখে শেখ, শেখ। কখন চান করে, খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে।

কোথায় জল, কোথায় তোয়ালে! শিশুর কল্পনায় নিমেষে সব এসে যাচ্ছে। ছোটো ছোটো হাতে অদৃশ্য তোয়ালে দিয়ে বৃদ্ধের শুকনো, শীর্ণ মুখ মোছানো, পাউডার মাখানো, সবশেষে কপালে অদৃশ্য টিপ পরানো। কাড়ে আঙুলটা কুটুস করে কামড়ে দেওয়া।

ডাক্তার বদল করতে হল। ফুসফুসে বাতাস ঢুকছে না। সেখানে গজলের মাইফেল চলেছে। চড়া পর্দায় বেলো ফুটো হারমোনিয়ামের সিঁসিঁ শব্দ। জিন্দেগি, জিন্দেগি, এদিকে সামান্য কয়েক সি সি বাতাসের জন্যে আমার জিন্দেগি কাতিল হয়ে গেল। নতুন ডাক্তারবাবু বয়েসে তরুণ। ফুসফুসের বিষয়টা গুলে খেয়েছেন। প্রেসক্রিপশন দেখে বললেন, এক্স-রে না করিয়েই এই চড়া অ্যান্টিবায়োটিক এতগুলো খেয়ে বসলেন। এই বয়সে কাজটা ভালো হল কী! এখন সব ওষুধ বন্ধ। আগে এক্স-রে।

পুত্রবধূর সঙ্গে আমার সম্পর্কটা বন্ধুর মতো। তেএঁটে মার্কা শ্বশুর হওয়ার চেষ্টা করিনি। করলেও হতো না। মানাত না। যারা ছেলেবেলায় কম খেয়ে ম্যালনিউট্রিশনে সারাটা জীবনই ছোকরা মেরে থাকে তারা কোনোদিন ডাকসাইটে বাবা, কী নিপীড়ক শ্বশুর হতে পারে না। এইটা আমার জীবনে শাপে বর হয়েছে। বাড়ির পরিবেশে কোনো টানটান, গুমোট ভাব নেই। এটা হল না, ওটা হল না, এ কি করলে মা, এই জাতীয় কোনো ভ্যানতাড়া নেই। ডিসিপ্লিন ডিসিপ্লিন করে শাস্তি চটকানো লোহার সংসার তৈরি হয়নি। যেমন জোটে, খাও দাও আনন্দে থাকো। বাইরের জগৎটা তো কেলসে গেছে, ভেতরটাকে অহংকারের ঠুসঠাসে অশান্ত করে তুলো না।

ডাক্তারবাবু চলে যেতেই পুত্রবধূ বললে, নাও, রাজবেশ ছেড়ে তৈরি হও। চলো এক্স-রে।

আজ থাক না রে, কাল হবে।

তোমার পরামর্শে আর চলছি না ভাই। এবার আমার ম্যানেজমেন্ট। মা থাকলে তোমাকে পেটাত। নিজের ওপর অত্যাচারের একটা সীমা আছে। তুমি পরশু কৈলাসকাকুর বাড়িতে আইসক্রিম খেয়েছ?

কে বললে?

আমার গুপ্তচর সর্বত্র। কাজটা ভালো করেছো? তোমার ছেলেকে বললে, ফাটাফাটি করবে। সেইটাই চাইছ।

এক্সরে কারখানায় গেলুম। জামা, গেঞ্জি খুলে একটা প্লেটে বুক ঠেসে, দু-হাত ওপরে তুলে, দমবন্ধ অবস্থায় অন্তর্লোকের ছবি তোলালুম। দু-জনে যখন একসঙ্গে বেরোই তখন একটু মার্কেটিং হয়। সেটা বেশ সুখের, আনন্দের অভিজ্ঞতা। স্বামীর কাছে যতটা না ফ্রি হতে পারে, আমার কাছে পারে। আমি মানুষের স্বপ্ন পড়তে পারি। ভেতরের আনন্দ দেখতে পাই। অল্প কিছু নিয়ে থাকার মহানন্দ। এটা তনুরও ছিল। সব মেয়েরই থাকে মনে হয়। আধুনিকতার এনামেলটা সরাতে পারলেই অকৃত্রিম অন্তরের উন্মোচন। কাপ, ডিশ, একটুকরো প্লাস্টিক, আশায় ভরা কাপড়কাচার গুঁড়ো, প্রতিশ্রুতি জড়ানো শ্যাম্পু, স্বাদে ভরা চানাচুর, কাপড় শুকোতে দেওয়ার ক্লিপ, দু-পাতা টিপ, পূজার জন্যে বিস্কুট। আধুনিক দোকান সাজসজ্জার লোভনীয়। কিছুক্ষণ দাঁড়াতেও ভালো লাগে। হেটোর হেটোর করে হাঁটা। অনর্গল কথায় বেশ গোছানো ভবিষ্যতের ছক কষা। আসছে, আসছে, আসতে পারে, এইটাই ভালো। আসবে যে না সে তো সবাই জানি। পরাজয়ের একটা ধারাবাহিকতা থাকে। সেখান থেকে বেরনো যায় না। মাস্টারমশাই পরাজিত, আমিও তাই, আমার ছেলে কেমন করে টগবগিয়ে ঘোড়া ছোটাবে। আশা করাটাই অন্যায়।

সংসারের বাইরে দু-জনে গল্প করতে করতে সময়কে ফাঁকি দিয়ে অসুখকে কলা দেখিয়ে হু হু গাড়ি, টেম্পো, লরি, অটোর এলোমেলো ছোটাছুটির বৃত্তে গা বাঁচিয়ে, খানিক ঘোরাঘুরি হল। ঘরে ফিরেও খুব খারাপ লাগল না। বাইরে বেড়াতে গিয়ে হোটেলে ফেরার মতো। এমন এক রাজা, যেখানে কোনো সংবিধান নেই, রাজা নেই, অনুশাসন নেই। নীল আকাশের নীচে এই পৃথিবী, পৃথিবীর পরে ওই নীল আকাশ।

পরের দিন ফুসফুসের ছায়াচিত্র চোখ রেখে ডাক্তারবাবু বললেন, এ তো দেখছি আরতি হচ্ছে। এত ধোঁয়া ঢোকালেন কী করে!

সে তো সবাই জানে। কলকাতার মানুষ। মাছ যেমন জলে, আমরা সেইরকম লাখ লাখ মানুষ ধোঁয়ায় খলবল করছি। কতরকমের ধোঁয়া।

এই যে দেখছেন, সাদা সাদা ঢেউ খেলানো দাগ, এগুলো আপনার শ্বাস নেওয়ার চেষ্টা।

ও আর আমি দেখে কী করব।

আহা, জিনিসটা তো আপনার! কী করছেন স্বচক্ষে একবার দেখুন।

মনে মনে বললুম, হেট দ্য সিন, নট দ্য সিনার।

তাহলে আগের ওষুধ আর চলবে না। অ্যান্টিবায়োটিকের অন্য গ্রুপে যাওয়া যাক।

আগের বেশ কিছু ওষুধ যে রয়েছে। অনেক দাম।

সে আপনাকে ভাবতে হবে না। আপনার বউমা ভাববে। নিশ্চিন্তে আপনি সুস্থ হওয়ার চেষ্টা করুন।

এই নিন, গোল, গোল, গোল। তিন গোল্লা, মানে সকালে-দুপুরে রাতে। খাওয়ার পর একটা করে। আর এই দু-জোড়া চামচে এঁকে দিলুম। কাফ সিরাপ। দু-চামচ করে দুবার। একটু নির্মল বাতাসে থাকার চেষ্টা করুন। অ্যাভয়েড ডাস্ট, স্মোক, স্পাইসি ফুড, টেনশন, অ্যাংজাইটি। পড়তে হলে নতুন বই পড়বেন, পুরনো বই চলবে না। বিছানায় না শোয়াই ভালো।

বসে থাকা চলবে?

তা চলতে পারে, তবে শান্ত সংযত ভাবে। ধপাস ধপাস করবেন না। তুলোর ধুলো আপনার পক্ষে ডেনজারাস। ঢ্যাঁড়স, বেগুন, টম্যাটো, টক ফল, ডাল চিংড়ি, কাঁকড়া, ইলিশ, আইসক্রিম, দই, মিষ্টি তেলেভাজা স্পর্শ করবেন না।

বাকি রইল কী?

এইবার নিজে নিজে পরীক্ষা করবেন। এক একটা জিনিস খাবেন, অপেক্ষা করবেন, যেই দেখবেন বাড়ছে, সঙ্গে সঙ্গে বাতিল। এইভাবে যা থাকে সেইটাই আপনার খাদ্য।

ফ্যামিল হিস্ট্রিতে তো হাঁপানি নেই।

ইতিহাসের কতটুকু জানেন, গ্র্যান্ডফাদার, গ্রেট গ্রেট গ্রেট গ্রেট টু দ্যা পাওয়ার ইনফিনির্টি।

গ্রান্ডফাদার। অদম, ইভেও চলে যেতে পারেন। ভগবান কেন আপেল খেতে বারণ করেছিলেন। হোয়াটি ওয়াজ দ্য মেডিসিন্যাল কজ। আপেল টক। খেলেই রেসপিরেটারি। ডিসট্রেস বাড়বে। অনেক কিছু চিন্তা করার আছে। মিথের মধ্যে ট্রুথ আছে।

ডাক্তারবাবু প্রেসক্রিপশন ঠুকে দিয়ে চলে গেলেন। বাথরুমে ঢুকলুম চান করতে। চিরকালের অভ্যাস, বালতিতে জল পড়ার শব্দের সঙ্গে রাগ-রাগিনীর আলাপ। ভৈরবী আসতে পারে, চৌড়ি এসে যেতে পারে। ভৈরো এলে বহুত আচ্ছা। স্বরচিত গানে সুরবসাতে পারি। মিঞামল্লার ধরেছিলুম হঠাৎ কাশি, ভয়ঙ্কর রকমের। গাইতে চেয়েছিলুম গান, শুরু হয়ে গেল বাজনা। ব্রাত্যজনের রুদ্ধ সংগীত। শেষে এমন হল, দম নিতে পারি না। আঁকুপাকু অবস্থা। সেই সময় মনে হল, বাথরুমে মরাটা কী ঠিক হবে! মানুষ কত পবিত্র জায়গায় মরে।

তীর্থে, জাহ্নবী কূলে। অর্ধঅঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্ধঅঙ্গ, থাকবে স্থলে। কেহ বলবে হরে হরে, করে করে দিয়ে তালি।

মনে হওয়া মাত্রই দমাস করে দরজাটা খুলে ফেললুম। বাইরে উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে পুত্র, পুত্রবধূ, পূজা। আমার কষ্টে সকলের মুখে যন্ত্রণা।

পূজা এগিয়ে এসে হাত ধরল, তোমার খুব কষ্ট হচ্ছে দাদাই!

উত্তর দিতে পারছি না। সামান্য একটু বাতাস চাই। টাকা, সম্মান, সম্পত্তি, সব বৃথা। একটু বাতাস।

আমার অবস্থা দেখে পূজা কেঁদে ফেলল, দাদাই ওমা! দাদাই!

আমি জানালায় মাথা রেখে দাঁড়িয়ে আছি। পুত্রবধূ আমার পিঠে হাত ঘষছে। পুত্র বলছে এসব ডাক্তারে হবে না।

আমি ভাবছি, মানুষের মৃত্যুটা মোটেই সুখের নয়। জন্মেও যন্ত্রণা, মৃত্যুতেও যন্ত্রণা। বাঁচাটাও যন্ত্রণা। ভাবছি, আবার একবার পৃথিবীতে আসব কী না! হলুদ রোদে সবুজ পাতা ঝিলমিল করছে। তিনটে পাখি গান গাইছে। অ্যান্টেনায় ধ্যানস্থ মাছরাঙা। এই সব দেখছি, সামান্য একটু বাতাসের জন্যে হাপরে মতো হাঁপাচ্ছি। পৃথিবীতে এত বাতাস আর হরিনামের ঝুলির মতো আমার এই ফুসফুসে এক চুমুক বাতাস কেন ঢোকে না। ভাবছি, মুহূর্তে প্রাণ যদি বেরিয়ে যায়, তাহলে পাখি হয়ে কিছুক্ষণ অ্যান্টেনায় বসব। তারপর উড়ে যাব। যে-স্কুলে পড়তুম, সেই স্কুলবাড়ির গম্বুজে। সেখান থেকে কালীমন্দিরের চূড়ায়। প্রাচীন বটগাছ অন্য পাখির জটলায় কিছুক্ষণ কাটাব। তারা বুঝতেই পারবে না, এ পাখিটা অন্য জাতির পাখি, প্রাণপাখি। তারপর কৈলাসের বারান্দায় গিয়ে বসব। কৈলাস ভাববে, পাখিটার মন খারাপ। স্বজন হারানোর বেদনায় কাতর। নিজের চেয়ে স্বজন আর কে আছে। সেই নিজেকেই তো হারিয়েছে পাখি। ইতিমধ্যে আমার দেহ খাটে চেপে শ্মশানে এসে যাবে। ষাট, বাষট্টি বছরের প্রাচীন আবাসস্থল। জিওল গাছের ডালে বসে ছাই হওয়াটা দেখব, তারপর সিন্ধুসারসের মতো উড়তে উড়তে পশ্চিম আকাশের দিকে যেতে যেতে বিন্দুর মতো রেণুর মতো অদৃশ্য। কিছুকাল চন্দ্রবিন্দুর চুটকি লাগানো নামটা পড়ে থাকবে। দু-একটা কাগজে, খাতায়, পাতায়, রেকর্ডে।

এই সব ভাবনার মধ্যেই আমাকে বসিয়ে ফেলা হয়েছে। যাকে বলে স্কোয়াট। আমার পুত্রবধূ পিঠ থাবড়াচ্ছে। পূজা ছোটো ছোটো হাতদিয়ে বুকের কাছটা মালিশ করছে। আর কিছুটা ব্যবধানে, আমার পুত্র চ্যুতরাজ্য রাজার মতো পায়চারি করছে আর বলছে, সামথিং মাস্ট বি ডান, সামথিং মাস্ট বি ডান।

এই সময় কৈলাস এসে হাজির। সকলের উতলা অবস্থা দেখে বললে, হাঁপানি সারে না বাবা!

আগুনে ঘৃতাহুতি হল। উত্তেজিত পুত্র আরো উত্তোজিত হয়ে বললে, কাকাবাবু, দিস ইজ নট হাঁপানি।

দেন হোয়াট ইজ ইট?

দিস ইস অ্যালার্জি। কয়েক হাজার বইয়ের ধুলো। সারা বাড়ি তো বইয়ে ঢাকা। যত না পড়ে তার চেয়ে বেশি ঝাড়ে। ডাস্ট অ্যালার্জি। মা থাকলে বাড়াবাড়িটা কম হতো। মা তো নেই। সারাদিন ঝাড়ন হাতে নৃত্য করে বেড়াচ্ছে। এ হল সরস্বতী পাউডারের এফেক্ট।

বাবা যার নাম কেষ্ট তার নামই কৃষ্ণ। অ্যালার্জিও হাঁপানি। একে নিয়েই ঘর করতে হবে। তবে মন্দের ভালো, হাঁপানিতে পরমায়ু বেড়ে যায়। দমের কাজ হয় তো, ফুসফুসের স্ট্রেংথ বাড়ে। হাঁপানি বলে স্বীকার করে নিতে তোমরা লজ্জা পাচ্ছ কেন? পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো লোকেরই হাঁপানি ছিল, আছে, থাকবে। রাষ্ট্রনায়ক, যোদ্ধা, লেখক, অভিনেতা, বিশ্বসুন্দরী। হাঁপানি, টাক, সুগার, আরথারাইটিস, চিতায় না চড়ালে কিয়োর হয় না।

কৈলাস চলে গেল। সত্য কথা বলার অপরাধে সবাই ক্ষুব্ধ। আরো নামকরা একজন ডাক্তারবাবুর খবর এল। রিপোর্ট আর প্রেসক্রিপশনের ফাইল নিয়ে তথায় গমন। সময়টা খুব অদ্ভুত। রাত সাড়ে দশটা। চেম্বার উপচে রুগিরা সব রাস্তায় ছড়িয়ে পড়েছেন। সকলেরই ফুসফুস বিকল। বিভিন্ন বয়েস। আমিও তাঁদের একজন হয়ে ফুটপাথের একপাশে দাঁড়িয়ে হাঁপাতে লাগলুম। অদুরেই কলকাতার ফূর্তি পাড়া। সেই বিখ্যাত প্রাচীন রেস্তোরাঁ। মেট্রো রেলের কুদলে রাখা রাজপথ। টানা রিকশায় নেশায় কাত হয়ে চলেছেন রহিস আদমি। পকেটের, পেটের, বুকের ত্রিবিধ শক্তিতে বলীয়ান হয়ে রাতের অভিসারে চলেছেন জনপদবধূর কুঞ্জে। এদের বুকে এখনো প্রচুর বাতাস। নায়িকারা মাঝে মাঝে হাওয়া খেতে বাইরে বেরিয়ে আসছে। মাছরাঙার মাছ ধরার কায়দায় খদ্দের ধরে নিয়ে যাচ্ছে। রাত ক্রমশ গভীর হচ্ছে। ঘর ক্রমশ খালি হচ্ছে। অবশেষে তারিখ বদলের কিছু আগে ডাক পড়ল।

ডাক্তারবাবু তখন কফি ব্রেক। বুকের ছবি আলোকিত পর্দায় আটকালেন। এক চুমুক কফি, তারপর প্রশ্ন,

ডেলি ক-প্যাকেট চলে?

আজ্ঞে আমি জীবনে ধূমপান করিনি। যখন ছোটো ছিলুম, তখন একবার কালীপুজোর সময় প্যাঁকাটি টেনেছিলুম।

শুয়ে পড়ুন।

সহকারি উলটো দিকে একা বিছানা দেখালেন। দেয়ালে স্টেথিস্কোপ ঝুলছে। সেই পুরোনো ধরনের পরীক্ষা। জোরে, আরো জোরে। ভস ভস করে। উঠে বসলুম।

সমস্ত ওষুধ গঙ্গার জলে ফেলে দিন। কে বলেছিল খেতে! ওই ওষুধের ঠেলায় তো সব জড়িয়ে গেছে ল্যাংসে। কে ছাড়াবে মশাই! কার অত সময় আছে! লাংস দুটোকে তো অ্যারারুটে চুবিয়ে এনেছেন।

আমার ঠিক কী হয়েছে ডাক্তারবাবু!

ইউ আর সিটিং অন এ ভলক্যান।

কী করব ডাক্তারবাবু?

স্রেফ ওইটা মনে রাখবেন। স্মরণ, মনন, নিদিধ্যাসন। তিনটে পাফ দিলুম। সকাল, সন্ধে, রাত্তিরে। ঠোঁট দুটো ফাঁক করে ফ্যাঁস, ফ্যাঁস।

আবার আসব কী?

না এসে যাবেন কোথায়!

রাত বারোটা। চেম্বারে তখনো দশজন। না, আমি একা নই! আমার দলে অনেকেই। ওয়ার্কর্স অফ দ্য ওয়ার্লড ইউনাইট। ইনকিলাব। ওয়াকার তো বটেই। চব্বিশ ঘণ্টা হাপর চালাই। নো ওয়ার্ক নো পে। পরের দিন দুশো টাকা নিয়ে তিনটে ভসভসি কিনতে গেলুম। পদ্মা মেডিকেলের মালিক হেসেই অস্থির। শ পাঁচেক লাগবে মশাই।

ফাইভ হানড্রেড! কমে কিছু হয় না?

হয়, পুরনো ঘি। জোগাড় করুন।

সেই কালো কালো বিশ্রী দুর্গন্ধ। ঠাকুরদা ঠাকুরমার কালের ব্যাপার!

ঘি পুরনো হলে আর ঘি থাকে না। আত্মশক্তি, বজ্রশক্তি, মহাশক্তি, মা চণ্ডী। আপনি যে রাস্তায় চলেছেন, সে রাস্তাটা হল বধরস্য ধনক্ষয়। কোনোদিন দেখেছেন, হাঁপানি সেরেছে। টাকে কেষ্ট ঠাকুরের মতো চুল গজিয়েছে, কাজের মহিলা তিরিশ দিন এসেছে, মুখরা স্ত্রী ঝগড়া ভুলতে পেরেছে। এই দেখুন, আমার দুটোই আছে। বিশ্বজোড়া টাক আর বুক ভরা অ্যাসথামা। অশ্বত্থামা। মহাভারত তো পড়েছেন! রাত্রে গুপ্তভাবে পাণ্ডব শিবিরে প্রবেশ করে ধৃষ্টদ্যুম্ন, উত্তেমৌজা, যুধামন্যু, শিখণ্ডী, দ্রৌপদীপ পাঁচপুত্র আর পাণ্ডু শিবিরের সমস্ত সৈন্য, হাতি, ঘোড়া ফিনিশ করে দিলেন। শেষে ব্রহ্মশিব অস্ত্রে উত্তরার গর্ভের শিশুটিকেও নিধন করলেন। কুরুক্ষেত্রে কৌরব পক্ষের প্রায় সবাই মরেছিলেন, একমাত্র অশ্বত্থামা পাণ্ডবদের মণি দান করে বনে চলে যান। এই অপরাজয়

অশ্বত্থামই হল অ্যাসথামা। আর ওই মণিটা হল ভসভস হাঁপানি। এই হল মেডিকেল মহাভারত।

তাহলে কী করবো।

যদি ট্যাকের জোর থাকে তাহলে এইসব ফ্যাঁসফেঁসে কিনুন, আর তা না হলে ঘরে বসে জীবনের যে-কটা দিন তলানি পড়ে আছে শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করুন। তিনিই যোগবলে উত্তরবার গর্ভস্থ সন্তানকে জীবিত করেছিলেন অশ্বত্থামার কোপ থেকে পৃথিবীকে রক্ষা করেছিলেন তাকে ঝোপে পাঠিয়ে। এই তো আমার এত বড়ো দোকান, ওষুধের তো শেষ নেই! আমি কী করি!

কী করেন ভাই?

প্রথম যেদিন শুরু হল, অতটা বুঝিনি। ভোরে প্রবল কাশি। থামছে না। ঘরে বসে কাশব। পরিবার পরিজন উঠে পড়বে। বিরক্ত হবে। ছাতে গিয়ে কাশব, এ তো মসজিদের আজান নয় যে পল্লীবাসী সহ্য করবে। বাথরুমে কাশব। পাশের ঘরেই পুত্র-পুত্রবধূ। সবে বিয়ে হয়েছে, খোঁয়ারি ভাঙেনি এখনো। মহা সমস্যা। প্রাণ খুলে কোথায় গিয়ে কাশি! কাশিকে ভয় পাই না, ভয় মানুষের সহানুভূতি আর ঘৃণাকে। কেউ যেন না বলতে পারে, ইউ আর এ নুইসেনস!

খাঁটি কথা। আমারও একই অবস্থা। আমি কাশছি, হাঁইফাঁই করছি, আর সবাই গেল গেল করছে। তা আপনি কী করলেন।

অ্যাজমা তো মেডিকেল সায়েনসের আওতায় পড়ে না। ম্যানেজমেন্ট সায়েনস। প্রথম প্রথম বাড়িসুদ্ধ সবাই আমার চারপাশে দাঁড়িয়ে হায় হায় করত। বুকে, পিঠে হাত বেলাতে, রসুন তেল মালিশ করত। যেই জেনে গেল হাঁপানি, তিরানব্বইয়ের আগে নড়বে না, তখন দেখলুম, আমি একা। সকলেই বলতে লাগল, তোমার তো হাঁপানি। আড়ালে আদর—হেঁপো। শত্রুদের চোখে বেটা হেঁপো। তখন আমি মেডিসিন ছেড়ে ম্যানেজমেন্টে গেলুম। কাশার একটা জায়গা বাড়ির মধ্যেই খুঁজে বের করলুম। সেইটাই আমার কাশীধাম, বারাণসী। রান্নাঘরের পাশে ভাঁড়ার ঘর। জানালা নেই। শব্দ বাইরে যাবে না। সেইখানেই আমি ভোরটা ম্যানেজ করি। প্রথমে প্রাণ খুলে উদারা, মুদারা, তারায় কাশতুম। শেষে প্রফেশনাল কাফার হলুম। সেটা শিখলুম আমার কুকুর জুলির কাছে। জুলি যখন তারস্বরে ভৌ ভৌ করে, তখন কোনো লাভ হয় না, ভুকভুক করবেন, মাঝে মাঝে ভৌ। ভৃত একটা জায়গা খুঁজে নিন। পেয়ে যাবেন। মাঝে মাঝে দরবারিতে গাইবেন—আমি তো তোমারে চাহিনি জীবনে তুমি অভাগারে-চেয়েছ। আমি না ডাকিতে হৃদয় মাঝারে নিজে এসেদেখা দিয়েছো।

আমি যাঁর চিকিৎসায় আছি তাঁরও অ্যাজমা। ফলে ভালোই হয়েছে। মাঝে মাঝে ফোন,

—হ্যালো, ডাক্তারবাবু খবর কী?

—উঁকি মারছে। আপনার।

—নহবত বসছে।

—মেরে দিন, এক ডোজ ডেকাড্রেন, ডেরিফাইলিন পাঞ্চ করে।

আমরা সবাই এক সুরে বাঁধা। একই সূত্রে বাঁধিয়াছি সহস্র পরাণ, বন্দেমাতরম।

কৈলাশকে বললুম, কৈলাস এই ব্যাপার। তুই আমার একটা ব্যবস্থা করে দে। রান্নাঘর, শোয়ার ঘর, বসার ঘরের মতো, কাশির ঘর। গুদোম-টুদোম হলেও চলবে। একান্তে বসে কাশব। হাঁপাব। তনু হাঁপানি হয়ে ফিরে এসেছে। মনে বনে, কোণে, তাকে নিয়ে থাকব। শেষে একদিন, গুদোমে গুমখুন।

একটি মেয়ের আত্মকাহিনি

চাঁদের আলোয় তেপান্তরের মতো একটা মাঠ। মাঠের মাঝখানে তেলমাখা একটা তাগড়া ঘোড়া দাঁড়িয়ে আছে। চেস্টনাট ব্রাউন তার রঙ। চামরের মতো লেজ দোলাচ্ছে। ওই ঘোড়াটাকে ধরতে হবে। পিচ্ছিল পিঠে চেপে বসতে হবে। ঘোড়াটা দিগ্বিদিগ জ্ঞানশূন্য হয়ে ছুটবে। চেষ্টা করবে ফেলে দিতে। তোমার কসরতটা হবে, চেপে থাকা। পড়ে গেলে তুমি তোমার সার্কিটের বাইরে চলে গেলে। পৃথিবীটা এখন রেসের মাঠ। সকলেই জকি।

দীপার বাবা পয়সাঅলা লোক। জাহাজের মাল খালাসের কারবার, স্টিভেডার। বেহলার দিকে বৃহৎ বাগান বাড়ি। তিন পুরুষের ব্যবসা। বেশ থকথকে পয়সায় ডুবে আছেন। পয়সাও একধরনের পাঁক। একমাত্র মেয়ে দীপাকে রেখে মা মারা গেছেন। দীপা বড়ো হয়েছে একটা ভয়ের পরিবেশে। তার বাবা, কাকা, জ্যাঠামশাই, সব দৈত্যের মতো দেখতে। কংস, দুর্যোধন, দুঃশাসন। দীপার সেইরকমই মনে হত। হাঁউ হাঁউ করে কথা। গগন ফাটান হাসি। গপ গপ করে খাওয়া। এক একজন এক এক কেজি মাংস খেয়ে ফেলতেন। দাঁতে হাড় ভাঙতেন মটমট করে। মজ্জাটা চুষে নিতেন স্যুৎ স্যুৎ শব্দে। মনে হত, তিনটে রাক্ষস পাশাপাশি খেতে বসেছে। চিৎকার করে বলতেন, ভাত দিয়ে যাও। লে আও ঝোল। থলথলে ভুঁড়ি। বাড়িতে সকলেই চেক চেক লুঙ্গি পরতেন। কাঁধ কাটা গেঞ্জি। মোটা মোটা হাতে বড়ো বড়ো লোম। ঢেলা ঢেলা চোখ। চোখের কোলে পাউচ। রাতের দিকে সব মদ্যপান করতেন। নেশা হলে দীপার কাকাবাবু নিজেকে খুব অপরাধী ভাবতেন। যে সামনে আসত তাকেই বলতেন, পা থেকে জুতো খুলে আমাকে প্যাঁদাও। আমি কী করেছি জানিস! প্রশ্নটা করার পরেই একটা অ্যান্টি ক্ল্যাইম্যাক্স হত। সবাই যখন ভাবছে, না জানি কত কী পাপের ফিরিস্তি বেরিয়ে আসবে, কাকা কান্না জড়ান গলায় বলে উঠতেন, আমি কিস্যু করিনি। কারুর জন্যে কিস্যু করিনি। করবও না কোনোদিন। প্যাঁদাও, শালাকে উত্তম মধ্যম প্যাঁদাও, জুতিয়ে খাল খিঁচে নাও।

ঠিক সেই মুহূর্তে জ্যাঠামশাই নেশার ঘোরে বলতেন, ইস্, নাদুটা সব সিক্রেট আউট করে দিলে। মুকুজ্যে পরিবারের মানসম্মান আর কিছুই রইল না। আমার ঘোড়াটা নিয়ে আয়। বিশ্বাসঘাতকটার বুকে বুলেট চালাই। মীরজাফর, মীরজাফর।

দীপার বাবা নেশার ঘোরে হয়ে যেতেন, চিফ জাস্টিস, ক্যালকাটা হাইকোর্ট।

তিনি খুব গম্ভীর গলায় বার বার বলতেন, সাইলেন্স; সাইলেন্স। দিস ইজ কনটেম্পট অফ দি কোর্ট। টার্ন দেম আউট, টার্ন দেম আউট। নাদু উইল বি হ্যাঙ্গড টিল ডেথ।

দীপার ঠাকুরদা বেঁচে ছিলেন। যথেষ্ট বয়েস। প্রায় অথর্ব। একটা ঘরে শুয়ে শুয়েই দিন কাটাতেন। সেবার জন্যে একজন নার্স দিলেন। বেশ স্বাস্থ্যবতী। মুখটা ছিল মাঙ্গোলিয়ান ধাঁচের। মহিলা দীপাকেও খুব ভালোবাসতেন। ঠাকুরদা মাতালদের এই হট্টগোলের সময় কেবলই বলতেন, সন্ধের আর কত দেরি।

রাত আটটা সাড়ে আটটার পর দীপা ভয়ে কুঁকড়ে যেত। চেনা মানুষগুলো সব অচেনা হয়ে যেত। রান্নাঘরে দুজন রাঁধুনি ভালোমন্দ রাঁধছে। রান্নার গন্ধে বাড়ি ভাসছে। কাজের লোকরা ব্যস্তসমস্ত হয়ে ঘুরছে। নানারকম ভাজাভুজি নিয়ে মদের আসরের দিকে ছুটছে। সেখানে দুচারজন বাইরের লোকও থাকত। বাবুদের পেয়ারের বন্ধু, মোসায়েবের দল। পরের পয়সায় মদ খাওয়ার জন্য আসত। তাদের মধ্যে একজন নেশার ঘোরে মেয়েদের মতো ঘুরে ঘুরে নাচত। আর একজন গম্ভীর গলায় বলত, সাধু, সাধু।

বউরা সব ভয়ে সিঁটিয়ে থাকত। এদের পয়সা ছিল। জাহাজের বিদেশি মাল বাড়ি বোঝাই। মানুষকে এরা মানুষ বলেই মনে করত না। দম্ভ ফেটে পড়ত। অভাবী লোকের সঙ্গে চাকরবাকরের মতো ব্যবহার করত। কথায় কথায় বলত জুতিয়ে লাশ করে দোবো। তিন ভাইয়ের তিনটে মটোর। বাইরে বেরোবার সাজগোজের কী ঘটা। লোকগুলোকে তখন ভীষণ বোকা বোকা দেখাত। দীপা ছিল নীরব দর্শক। মায়ের কথা তার মনেই পড়ে না। জ্ঞান হওয়ার আগেই তিনি মারা গিয়েছিলেন। দীপার মায়ের জন্যে দীপার বাবা কোনো আক্ষেপ ছিল বলে মনেই হয় না। ভদ্রলোক একমাত্র নিজেকেই ভালোবাসতেন। দীপার জ্যাঠামশাই ওরই মধ্যে কিছুটা সংবেদনশীল মানুষ ছিলেন। দীপার জ্যাঠাইমা ছিলেন বোকাসোকা। তিনিই দীপাকে মানুষ করেছিলেন। মুকুজ্যে পরিবারের বউরা সব অলস ছিলেন। অতিরিক্ত আলস্য ও প্রচুর প্রোটিনজাত খাদ্যে তাঁরা মেদভারে বিপর্যস্ত ছিলেন। পুরুষরা সেইটাই পছন্দ করতেন। এও এক ধরনের বিকৃত রুচি। দীপা বড়ো হয়ে বুঝেছিল, এটাও এক ধরনের ভালগার টেস্ট। বউগুলোকে করে ফেলেছিল জ্যান্ত পাশবালিশ। দীপার মনে হয়েছিল মেয়েরা বন্দি হতে পছন্দ করে। দাসত্বের প্রতি তাদের ভয়ঙ্কর আসক্তি। খাঁচা থাকবে। পুরুষের ভোগের সামগ্রী হবে। এই ভাবটা তাদের সংস্কারে চলে গেছে। মেয়েরা নিজেরাই মনে করে, তারা দেহ ছাড়া কিছুই নয়, ভিতরে একটা মন নড়াচড়া করে ঠিকই; কিন্তু সেই মনটা বিকলাঙ্গ। অন্ধকারে একটা পাখি। ভিতরটা খুব নোংরা। যা তা বই পড়ে। অশ্লীল আলোচনা করে। কাজের মেয়েদের সঙ্গে পরের বাড়ির আলোচনা করে। যখনই সুযোগ পায় আজে

বাজে সিনেমা দেখতে ছোটে। আর কুৎসিত সাজগোজ করে স্বামীদের সঙ্গে বিয়ে বাড়িতে হল্লা করতে ছোটে। সঙ্কীর্ণ মনের মানুষ সব। নিজেদের মধ্যে তুমুল ঝগড়া করে। তখন মুখের আর কোনো আগল থাকে না। বস্তির ভাষা ব্যবহার করে। স্বামীকে বলে ভাতার। বউগুলো সব মাগী। তখন মুখ চোখের চেহারা পাল্টে যায়। আঁচল খসে পড়ে। বিশাল বুক থল থল করে নাচতে থাকে। বৃহৎ নিতম্ব দুলতে থাকে। খোঁপা আলগা হয়ে যায়। গা থেকে একটা পাশবিক গন্ধ বেরোতে থাকে। সমস্ত হিংস্র পশুর সমাহার। মাসের মধ্যে তিন চার বার দীপা এই দৃশ্য দেখায় অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। কাকার উপর রাগ করে একদিন তার কাকিমা তিন বছরের মেয়ের গলা টিপে ধরেছিল। সেই মুহূর্তে তার কাকিমাকে মনে হয়েছিল মানুষ নয়, পিশাচিনী। ঘটনাটা ঘটছিল দুপুরে। সেই রাতেই দেখা গেল কাকিমা সেজেগুজে, দশ ভরি গয়না চাপিয়ে কাকার সঙ্গে গাড়ি চেপে পার্টিতে যাচ্ছে।

এইসব দেখে দীপার ভয় হত, তার ভবিষ্যৎটা কী হবে! ওই জ্যাঠাইমা, কাকিমার মতো মহিলা। কোনো একটা লোকের বউ। ব্যবসাদার, দালাল অথবা ফোড়ে। অনেক টাকা তার। গদগদ চেহারা। ধামার মতো ভুঁড়ি। গলগল করে ঘামে। মাংস খেয়ে দেশলাই কাঠি দিয়ে দাঁত খোঁচায়। ফুক ফুক করে ঘরের দেয়ালে কুঁচি ফেলে। বগলের চুলে ঘামে জড়িয়ে থাকা পাউডার। রাতের বেলা বিছানায় জড়িয়ে ধরে। লোমঅলা বুকে মুখ চেপে ধরে। এখানে ওখানে খামচায়। ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেহভোগ করে। অবাঞ্ছিত সন্তানের মা হতে হয়। দীপা স্বপ্নে দেখত, হাজার হাজার হাত অক্টোপাসের মতো এগিয়ে আসছে। বিশাল, বিকট একটা মুখ, কমলাভোগের মতো দুটো চোখ, শিমপ্যাঞ্জির মতো মোটা দুটো ঠোঁট, নর্দমার মতো নিঃশ্বাস। ছাঁত করে ঘুম ভেঙে যেত। রাতের কালো আকাশের দিকে তাকিয়ে মনে হত আত্মহত্যা করি। বাগানের ঝাঁকড়া গাছে কালপ্যাঁচা ডাকছে। উত্তরের পাঁচিলে হুলো বেড়ালের জৈব চিৎকার।

দীপা ঘর থেকে বারান্দায় বেরিয়ে আসত। অসুস্থ ঠাকুরদার ঘরে আলো জ্বলছে কম পাওয়ারের। নার্স দিদি ইউরিন্যাল দিচ্ছে। ছফুট লম্বা একটা মানুষের খাঁচা বিছানায় পড়ে আছে। কোনো আবরু নেই। লজ্জা নেই। ঠাকুরদার যৌবনের ছবিতে কী অহঙ্কার, কী দাপট! ইউরোপিয়ান পোশাক। নিষ্ঠুর দুটো চোখ, বাজপাখির মতো। শিকারের শখ ছিল। রাইফেল ছিল। বহুবার বিলেত গিয়েছিলেন। তিন ছেলে ও তিন মেয়ের জন্মদাতা। সেই মানুষটার কী অবস্থা। ছেলেরা ফিরেও তাকায় না, বউরা মাঝেমধ্যে আসে। সমস্ত দায়িত্ব ওই নার্সের।

দীপা কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে ফিরে যায় ঘরে। বয়সের তুলনায় তার চিন্তাটা ছিল অনেক পাকা। শরীরে নারীর সব লক্ষণই সুস্পষ্ট। রাতে কোনো কোনো

দিন নার্সদিদি তার পাশে এসে শুত। আদর করে জড়িয়ে ধরত। তখন দীপার মনে হত শরীরের কোনো একটা স্তরে কিছু একটা ঘটছে, যার অনুভূতিটা সম্পূর্ণ অন্যরকম। এই অনুভূতির মধ্যেই আছে নেশা, আছে শৃঙ্খল। একসময় দীপা নিজেকে সমর্পণ করে দিত তার হাতে। তখন অতটা বুঝত না, ব্যাপারটা কী হচ্ছে। এখন বোঝে। বুঝে আরো ভয় পেয়ে যায়। মানুষের স্বভাবে কী আছে কেউ বলতে পারে না। একটা গুহা আছে ভিতরে। বসে আসে প্রবণতা। আকর্ষণ এত প্রবল, অপেক্ষা করার উপায় নেই। দীপা উন্মুখ হয়ে থাকত। কখন সে আসবে। তাঁর একটা পাপবোধ। একটা অসুস্থতা। না জানার ভান; কিন্তু ভীষণ উপভোগ্য। যে রাতে ঠাকুরদা একটুও ঘুমোতেন না, সারাক্ষণ নার্সদিদিকে ওইখানেই ব্যস্ত থাকতে হত, দীপা রেগে যেত। অসুস্থ মানুষের কষ্টটা তার কাছে কিছুই নয়। নিজের সুখটাই বড়ো। এইটাই পৃথিবীর চরম সত্য। আমি আমি, তুমি তুমি। বাকিটা অভিনয়। লোকলজ্জা। বুদ্ধিমান মানুষ সেই কারণেই কিছু অনুশাসন তৈরি করে রেখেছে। কিছু কর্তব্য। ভাব, ভাবনাহীন কিছু করণীয় কাজ।

ওই বাড়িতে আরো কিছুকাল থাকলে দীপার কী হত এখন আর বলা যায় না। ঘটনাই ভাগ্য। দীপার বাবা ওই সময় এক চিত্রাভিনেত্রীর খপ্পরে পড়লেন। মহিলা তিন চারটে বাংলা ছবিতে নায়িকার ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন। প্রথমটা হিট করেছিল। মহিলার দেহ ছিল। কোনো এক পার্টিতে দীপার বাবার সঙ্গে আলাপ হয়েছিল সেই মহিলার। দীপার মায়ের মৃত্যুর পর দীপার বাবা একটা অস্বস্তির মধ্যে ছিলেন। সকালে উঠে টুথব্রাশ হারিয়ে গেলে যে অসুবিধে হয় অনেকটা সেইরকম। সুধন্যবাবু আর একটা অ্যাঙ্গুলার টুথব্রাশ পেয়ে গেলেন, তবে দামটা একটু বেশি। ছাপ মারা নায়িকা। শহরের দেয়ালে যার ছবি সাঁটা থাকে।

দুধরনের পুরুষ আছে, এক হিসেবী লম্পট, আর এক বেহিসেবি লম্পট। সব পুরুষই লম্পট যেমন সব কিশোরীই লেসবিয়ান। উত্তেজিত হয়ে লাভ নেই, আধুনিক মনস্তাত্ত্বিকদের এইটাই বক্তব্য। মানুষের কাণ্ডকারখানা দেখে তাঁরা অন্য কোনো সিদ্ধান্তে আসতে পারছেন না বলে মানবজাতির কাছে ক্ষমা চাইছেন। সুধন্য মুখার্জি ছাগলের মাংস ভয়ঙ্কর ভালোবাসতেন, সেই কারণে বুদ্ধিটাও হয়ে গিয়েছিল ছাগলের মতো। মানুষ তো এমননিই নাচের পুতুল, অদৃশ্য দড়ির টানে সারা জীবন হাত-পা ছোঁড়ে, এর সঙ্গে যোগ হল এক খেলোয়াড় মহিলা। ডবল ডিমের ওমলেটের মতো ডবল নিয়তি। বোকা-লম্পটদের মেয়েরা সহজেই চিনতে পারে। এই একটু গায়ে গা লাগিয়ে বসা, চোখের ভঙ্গি করা, শরীরের ঝলক দেখান, মাঝে মধ্যে হাসতে হাসতে গায়ে ঢলে পড়া, এই জাতীয় কিছু প্রাচীন টোটকাই যথেষ্ট। লোকটা একেবারে পোষা

কুকুর। পটাপট ল্যাজ নাড়বে। সুধন্যর ব্রেনের একটা অংশ অকেজো হয়ে গেল। অদ্ভুত একটা ইউফোবিয়া তৈরি হল। পৃথিবীটা হল নারী দেহ। মানুষ তার শৈশবটা কোনো রকমে পেরোতে পারলেই হয়ে গেল। তারপর স্রেফ নারী সম্ভোগ। প্রেম কাকে বলে, কবিতায় আছে না, সাহিত্যে আছে, ফুলে আছে না ফলে আছে ইত্যাদি গবেষণার প্রয়োজন নেই। লেগে থাক, জড়িয়ে থাক, নিমজ্জিত হয়ে যাও। অজগরের মতো গিলে ফেলুক তোমাকে। পৃথিবীকে ঘোরাচ্ছে কোনো শক্তি, কামিনী আর কাঞ্চন। সেই অভিনেত্রীর নাম ছিল রমলা। তাঁর জীবন কাহিনী একটু ঘোলাটে মতো ছিল। মা ছিলেন থিয়েটারের অভিনেত্রী। খুব দাপট ছিল। ইংরেজিটা ভালো জানতেন। সেকালের এক বিখ্যাত নটের বিপরীত অভিনয় করতেন কলকাতার এক নামকরা মঞ্চে। শেকসপিয়ারের নাটকেও তিনি অভিনয় করতেন। রমলার পিতা কে ছিলেন? রমলার মায়ের স্বামী ছিলেন কলকাতার নামজাদা এক কলেজের অধ্যাপক। অ্যানমিক চেহারা। অ্যাকাডেমিক টাইপ। উত্তর কলকাতার এক এঁদো গলিতে সাবেক কালের এক স্যাঁতস্যাঁতে বাড়িতে সেই অধ্যাপক থাকতেন। বিষণ্ণ পরিবেশ। একনাগাড়ে তিন চার মাস সেই বাড়িতে থাকলে আত্মহত্যার ইচ্ছে হওয়া স্বাভাবিক। অধ্যাপকের মাথায় পরিমিত টাক, চোখে পুরু চশমা। অ্যামিবায়োসিসের রুগি। সপ্তাহের তিনটে দিন মাথাধরায় কাবু। মাইগ্রেন। অধ্যাপক হিসেবে যথেষ্ট সুনাম ছিল। মানুষও ভালো। কেবল একটা জিনিসেরই অভাব ছিল, সেটা হল জীবনীশক্তি। প্যাঁ করে সানাই বাজল। মালা গেল এ গলা থেকে ওগলায়। কিছু লোক রাত বারোটা পর্যন্ত মহা হল্লা করে পোলাও, মালাইকারির ভুষ্টিনাশ করে গেল। রজনিগন্ধা দোলানো ভেলভেটের চাদর মোড়া বিছানায় এক যুবতীর পাশে তুমি শুলে। সেইটাই সব নয়, আসল খেল তারপরে। তাকত। কবিতাই শোনাও আর নীল আকাশে চাঁদ দেখাও; কিছুই কিছু নয়। তোমাকে হতে হবে একটা স্যাভেজ, ব্রুট। পশু না হলে তুমি নাম কা ওয়াস্তে স্বামী। তোমার স্ট্যাটাস হল সিঁদুরের একটি রেখা।

রমলা সেই বিবর্ণ মানুষটিকে বাবা বলে জানলেও, অধ্যাপক জানতেন রমলা তার সন্তান নয়। রমলার পিতা সেই মঞ্চ দাপানো অভিনেতা। যিনি মাইকেল হয়ে মেঘনাধ বধ আওড়ান, চাণক্য হয়ে দর্শকের অনুভূতিতে রোমাঞ্চ আনেন। যৌবন সমাগমে রমলাও অনুমান করতে পেরেছিল, এমন একটা দীঘল শরীরের নির্মাতা ওই অধ্যাপক হতে পারে না। রাতের পর রাত বালিশে পিঠ দিয়ে বসে বসে হাঁপান। শ্বাসের শব্দ শুনলে অবাক হতে হয়, পৃথিবীতে বাতাসের এত অভাব। মানুষটা গ্যালপিং রেটে বৃদ্ধ হয়ে শুরু করেছিলেন। করুণ চোখে নিজের স্ত্রীর দিকে তাকিয়ে থাকতেন। চওড়া পিঠে চকচকে চামড়া। ফেটে পড়া যৌবন। বর্হিমুখী মন। সংসারে অলীক মন বসে না।

পুরুষের সঙ্গ পছন্দ করে। যেসব পুরুষ অসুস্থ নয়, যাদের লিভার ভাল, শ্বাসকষ্ট নেই, ন্যায় অন্যায়ের অলীক বোধে পেন্ডুলামের মতো দোল খায় না, তাদের কাছে পরস্ত্রীর মতো সুস্বাদু স্যালাড আর কী থাকতে পারে। প্রবাদে আছে, আমি মাখবো ফলার, তুমি এসে খেয়ে যাবে। নেপোয় মারে দই।

অবশ্য রমলার মা বোকা ছিলেন না। অতিশয় খেলোয়াড় এক মহিলা। প্রতিভা তো ছিলই। নিষ্ঠুরতা স্বার্থপরতায় অদ্বিতীয়। কারুকার্য করা ভোজালির মতো। মণি বসান সাপের ফণার মতো। বিষাক্ত সুন্দর। পৃথিবীতে অমৃতের চেয়ে হলাহলের আকর্ষণ বেশি। এক ছোবলে মরব না; কিন্তু তিল তিল করে মৃত্যুর দিকে এগবো। সর্বনাশের আকর্ষণ। চরণামৃত খেলে মোক্ষ লাভ হয়। সেটা কী কেউ জানে না; কিন্তু কোকেন অথবা মর্ফিন সব গোলাপি; নভোচরের মত আকাশের দিকে উড়ে যাচ্ছি। পেঁয়াজের খোসার মতো পাতলা শাড়ি পরে চন্দন বর্ণা মহিলা ঘুরে ঘুরে নাচছে। যে সুখ পৃথিবীতে নেই সেই সুখে ভাসছি। নর্দমাকে মনে হচ্ছে যমুনা। সেন্ট্রাল নার্ভাস সিসটেমে সেতার বাজছে।

রমলার মা সেই দশকের কলকাতার হিরোইন। দুই অর্থে এক। নায়িকা প্লাস ড্রাগস। প্রবীণ মাজা ভাঙা সাহিত্যিকরা তাঁর পা চাটতেন।আর উপন্যাসে বড় বড় আদর্শের বুলি কপচাতেন। উপনিষদ পাঞ্চ করে মনে করতেন ক্ল্যাসিক লিখে ফেলেছি। সভার শাল জড়িয়ে বসতেন, সবাই মনে করত ব্রামার জেরক্স কপি। দাঁতে পায়োরিয়া, মুখে দুর্গন্ধ, ঘামে টকসিক স্মেল, গেলাস তুলতে গেলে হাত কাঁপে, উদরে কোষ্ঠকাঠিন্যের বাতাস। সমালোচকরা চারপাশে লেংটি ইঁদুরের মতো ঘোরে। স্তাবকরা খই ভাজার মতো প্রেক্ষাগৃহে বসে চটরপটর তালি বাজায়। কলের গোড়ায় লাগাম চরিয়ে বসে আছেন মঞ্চাভিনেত্রী। যখন পিছন ফিরে হেঁটে যান পুরুষদের গলা শুকিয়ে যায়। সামনে দাঁড়িয়ে যখন হাত তোলেন, মনে হয় নিয়তি। একজনের কাছেই নিজেকে সমর্পণ করেছিলেন, তিনি সেই নট, রঘুবীর।

রমলা সবই পেয়েছিল, মায়ের প্রতিভাটা পায়নি। মণি হীন ফণী। সুধন্য সেই চন্দ্রমুখীর নেশায় চুর হয়ে গেলেন। একটা বাড়িভাড়া করে সেই দুর্গ্রহকে প্রতিষ্ঠা করলেন। স্থির করলেন বিগবাজেটের একটা ফিল্ম করবেন। রমলাকে করে তুলবেন বাংলা চলচ্চিত্রের গ্রেটা গার্বো। ভাগাড়ে যখন নতুন মৃতদেহ পড়ে তখন শকুনরা সব খ্যা খ্যা করে ছুটে আসে। বাঘ যখন শিকার মারে ফেউরা সব দূরে বসে কেয়াবাত কেয়াবাত করে। সেইকালের এক মরফিনসেবী পরিচালক গন্ধে গন্ধে ছুটে এলেন। তিনি আবার কলকাতার এক মিশনারী কলেজে ইংরেজির অধ্যাপক ছিলেন। পাকতেড়ে চেহারার কোকেনসেবী এক লেখক তাঁর কোটর থেকে বেরিয়ে এলেন। এক ম্যাটিনি আইডল নায়ক রমলার বিপরীতে অভিনয় করতে নিমরাজি হলেন।

মদের ফোয়ারা ছুটল। মুরগি উড়ে গেল প্লেট প্লেট। রাতের পর রাত আলোচনা। কাউচে এলিয়ে আছেন রমলা। দু আঙুলের ফাঁকে লম্বা পাইপে লাগান সিগারেট। এনামেল করা ঠোঁটে মাঝে মাঝে টানছেন। ছাই ঝাড়ার দরকার হলে মিউজিক ডিরেক্টর অ্যাসট্রে এগিয়ে দিয়ে ধন্য হচ্ছেন। ফরাসি পারফুম জড়িয়ে আছে শরীরে। দিনে একরকম সুগন্ধ, রাতে আর একরকম। গবেষণার বিষয় গল্পটা কী হবে। প্রমথেশ বড়ুয়া, দেবকী বোস, জ্যোতির্ময় রায় পাঞ্চ। জবরদস্ত একটা ককটেল। ছবির সব ফ্রেমেই রমলা থাকবে।

সুধন্য মুখার্জি ব্যাঙ্ক যাচ্ছেন, বান্ডিল বান্ডিল টাকা তুলছেন, এম্পায়ার স্টোর্স বিলিতি সাপ্লাই করছে, বাথগেট থেকে আসছে পেটি পেটি সোডা ওয়াটার। দীপার জ্যাঠামশাই একদিন সুধন্যকে বললেন, "চৌবাচ্চায় ফুটোটা তা হলে তুমিই করলে।" প্রথমে মৃদুগলায় হচ্ছিল। দাদা তার ভাইকে সতর্ক করছেন। কর্তা এখনও জীবিত, তাঁর জীবৎকালেই লালবাতি জ্বেলে দেবে। জলের মতো টাকা উড়ছে। রমলার রসের ভিয়েন হচ্ছে। একটাই মেয়ে বড় হচ্ছে। বাপ যদি চরিত্রহীন হন মেয়ের ভবিষ্যৎ কী হবে।

আমি সিনেমা করব। প্রডিউসার। টাকাটা আমার চাই।

সিনেমা!

জ্যাঠামশাই আঁতকে উঠলেন। দীপা আড়াল থেকে দেখছে। বাবাকে চিরকালই তার মনে হত অচেনা একটা মানুষ। দুমদাম কথা বলে। যে কোনো কথা যে কোনো লোককে অক্লেশে বলতে পারে। বয়সের মর্যাদা দিতে জানে না। মানুষকে অপমান করে আনন্দ পায়।

জ্যাঠামশাই একটু সামলে বলেছিলেন, মাথাটা তাহলে সত্যিই খারাপ হল। সিনেমার তুমি কী বোঝো? কত টাকার ব্যাপার!

দশলাখ নিয়ে নামব। এতকাল জাহাজের পেটে জীবনটাকে নষ্ট করেছি।

জ্যাঠামশাই বললেন, এইবার মেয়েছেলের তলপেটে জীবনটাকে শেষ করবে।

দীপার বাবা সপাটে দাদাকে একটা চড় হাঁকালেন। নেশাটা চড়ছিল। বড় ভাই হকচকিয়ে গেলেন। সেই রাতটা ভোলার নয়। দীপা ছুটে এসে জ্যাঠামশাইকে জড়িয়ে ধরেছিল। জ্যাঠাইমা দৌড়ে এসে বলেছিলেন, দাদাকে মারলে! দীপার বাবা যে চেয়ারটায় বসেছিল, সেই চেয়ারটা উল্টে ফেলে দিয়ে বাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেল। এই চলে যাওয়াটাও দীপার মনে একটা স্থায়ী ছাপ রেখে গেছে। কেউ বাধা দিতে এগিয়ে আসেনি। দীপার মা বেঁচে থাকলে নিশ্চয় স্বামীর হাত ধরতেন। একটা নিঃসঙ্গ মানুষ চলে গেল। সারা বাড়ি থমথমে। দীপার সঙ্গে কেউ কথা বলছে না, যেন চড়টা সেই মেরেছে। বেশ বুঝতে পেরেছিল সবাই তাকে ঘৃণা করছে। দীপা বুঝে গিয়েছিল সংসারে সে একা। সেই রাতের আর একটা ঘটনা, রাত দুটোর সময় ঠাকুর্দা মারা গেলেন। সন্ধে

থেকেই ছটফট করছিলেন, কাকে যেন খুঁজছিলেন। কারো হাত ধরার চেষ্টা। একটা অজানা পথে একেবারে একা যাওয়া। নাস্তিক ভোগী মানুষরা মৃত্যুর সময় খুব ভয় পান। এপার থেকে ওপারে যাওয়ার সময় সঙ্গে কিছু নিয়ে যাওয়া যায় না। কেউ সঙ্গে যেতেও পারে না। তা ছাড়া একটা কষ্টও আছে, তখন আর শ্বাস নেওয়া যায় না। ভিতরের বন্দি বাতাস বেরিয়ে আসতে চায়। মৃত্যুর এক ভয়ঙ্কর যন্ত্রণা।

যখন মারা গেলেন, তখন যে যার ঘরে খিল এঁটে শুয়ে আছে। দীপার থেকে সেই মুহূর্তে যা বলা যায়নি, সেই চোখা চোখা কথা দীপাকে শুনতে হয়েছে। সব কথার সারাংশ হল, এই বাপের মেয়ে আর কত ভালো হবে। দুধ কলা দিয়ে কালসাপ পোষা। জ্যাঠাইমা মুখ ঘুরিয়ে নিলেন, কাকিমা ফড়ফড়িয়ে চলে গেলেন। ভাবটা এই, নান অফ মাই বিজনেস। বড়োর সঙ্গে হয়েছে বড়োর বউ বুঝবে। বড়ো হয়ে বড়োর সম্মান যদি আদায় করে নিতে না পারে, সে তোমার দোষ! বসে বসে মদ খাওয়ার সময় মনে থাকে না। ঠাকুরদার মৃত্যুর সময় আপনজনদের মধ্যে দীপাবলীই পাশে ছিল। মানুষ কীভাবে দুঃসহ যন্ত্রণায় মারা যায় একেবারে মাথার কাছে দাঁড়িয়ে দেখা হয়ে গেল। প্রাণবাবু বেরিয়ে যাওয়ার পর নার্স দিদিমণি পাশের টুলে যেমনভাবে বসে পড়লেন, যেন চা খেয়ে চায়ের কাপ নামিয়ে রাখল। কিছুই না পেয়ালা খালি হয়ে গেল। এইটা হয়তো তার অভিজ্ঞতায় একশো একতম মৃত্যু। দীপার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'আমার ছুটি হয়ে গেল। যাও ওনাদের ডাকো।'

ওদের সঙ্গে কথা বলতে দীপার একেবারেই ভালো লাগছিল না। বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে কাকা, কাকিমা, জ্যাঠামশাই জ্যাঠাইমা বলে ডাকতে তার ঘেন্না করছিল। কিছুক্ষণ বসে থেকে নার্স ভদ্রমহিলা বলেছিলেন, 'নাঃ ডেডবডিতে ঠান্ডা লেগে যাচ্ছে। যাই বাবুদের টেনে তুলি।'

ঘরে কম পাওয়ারের নীল একটা আলো জ্বলছিল। ঠাকুরদা চিৎ হয়ে শুয়ে আছেন অনন্ত নিদ্রায়। সাদা চুল, সাদা দাড়ি। ঘরের বাতাসে তখনো ঘুরে বেড়াচ্ছে তাঁর শেষ নিঃশ্বাস। নীল সমুদ্রে মৃত্যু নীল, অনন্তে নীল এক মানুষ। দীপার সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, এমন একজন মানুষের ছেলেরা এমন কেন হল। ঠাকুরদা তো ধার্মিক ছিলেন। ভাগবত পাঠ করতেন, গীতা পাঠ করতেন, মালা জপতেন, সন্ন্যাসী সঙ্গ করতেন, দান ধ্যান ছিল। দীপা ঠাকুরদার হাতটা ধরতে চেয়েছিল, ভয়ে পারেনি। মৃত্যুকে ভয় করে। এমনি দেখা যায় না। কিন্তু মৃতদেহে তার অবস্থান। ভেতরে তুমি কে? নিথর, নিস্পন্দ, দেহ খাঁচায় আমি মৃত্যু। আমি জীবনের সঙ্গেই থাকি। সময় হলেই জীবনকে ঠেলে বের করে দিয়ে দেহের দখলদারি নি। নীল, হিমশীতল মৃত্যু আমি। আমাকে স্পর্শ কোরো না। জীবনের মতো আমিও এক মহা সত্য।

ঘরে ঘরে আলো জ্বলে উঠল। ভোগের বিছানা ছেড়ে সব নেমে এলেন। মেয়েদের পোশাকে তখনো ঘুম কুঁচকে আছে। সহবাসের সুখ। এ কী মহা বিঘ্ন। মাঝরাতে কেউ মারা যায়। সেটা কী উচিত কাজ। টেলিফোনের ডায়াল ঘুরতে লাগল কড় কড় শব্দে। শহরের বিভিন্ন প্রান্তের আত্মীয়স্বজনদের ঘুম নষ্ট হল। বড় কর্তা পরলোক গেছেন। দুটো বেজে দশ মিনিটে ট্রেন প্ল্যাটফর্ম ছেড়েছে। তোমরা সব এস।

নাকের গর্তে তুলো গোঁজা হল। নাকের কাজ শেষ। চোখের পাতায় বসান হল চন্দন-তুলসী। একখণ্ড গীতা রাখা হল বুকে। রথে দাঁড়িয়ে আছেন শ্রীকৃষ্ণ। তিনি বলে গেছেন, মানুষ জন্মায় না, মানুষ মরেও না। অবিনাশী আত্মা। সবই অঙ্গুষ্ঠ পরিমাপের এক জ্যোতির্লিঙ্গের খেলা। তাকে না যায় ছেঁদা করা, না যায় তাকে কচুকাটা করা, না যায় তাকে আগুনে পোড়ানো। অজর অমর, শাশ্বত। নিত্য-শুদ্ধ-বুদ্ধ-মুক্ত। চড়চড়ে রোদ উঠল, তবু চড়া পাওয়ারের আলোগুলো নেবাবার কথা সবাই ভুলে গেল। দীপার মনে আছে, সে ঘুরে ঘুরে আলো নেবাচ্ছে, আর আত্মীয়, বন্ধুবান্ধবরা সব আসছে সেজেগুজে, মালা, ফুলের রিং, বোকে নিয়ে। একেবারে উৎসবের মেজাজ। গাড়ির পর গাড়ি। দরজা বন্ধের ঢিসঢাস শব্দ। কেউ কেউ ঢোকার আগে রুমাল ঘষে চোখ লাল করে নিচ্ছেন। মেয়েদের মধ্যে কেউ কেউ ফোঁস ফোঁস শব্দ করছেন। চোখে একটু জলও হয়তো আসছে। এরই মাঝে দীপার বড় পিসি এলেন। তিনি একটু আন্তরিকভাবেই কাঁদছিলেন। হাপরের মতোই শব্দ হচ্ছিল। বাবা বলছিলেন বারে বারে। শোনাচ্ছিল, ফাবা, ফাবা। বয়স্কা মহিলা। নানাবিধ ব্যাধিতে শরীর বিপর্যস্ত। তাঁকে ধরেছিলেন তাঁর স্বামী। রিটায়ার্ড ফরেস্ট অফিসার। মুখে অজস্র পাহাড়ি ভাঁজ। পাকানো গোঁফ। পেটানো চেহারা। বাঘ আর বউ দুটোকেই সমান ভালোবাসেন। গঙ্গার জল আর বোতলের জল দুটোরই সমান সেবা করেন। তিনি বউকে শান্ত করার চেষ্টা করছিলেন এই বলে, মাস্তু অনেকদিন বেঁচেছেন, ফুল টার্ম, ফুল টার্ম, আবার কী, আবার কী, রাইপ ওল্ড এজ। কেঁদে আর শরীর খারাপ কোরো না, তোমার আবার মাইগ্রেন আছে। এখুনি বমি শুরু হবে।

শান্ত করার আর প্রয়োজন হল না। তিনি এক ধাক্কায় ছিটকে পাশে সরে গেলেন। মেয়র এসেছেন। মেয়র। সারা বাড়িতে একটা ঢেউ খেলে গেল। লম্বা, কৃশ এক ভদ্রলোক, সাদা ট্রাউজার, কোট, পায়ে অক্সফোর্ড শু। চারপাশে চারজন স্তাবক। মশ মশ করে ঢুকলেন। একজনের হাতে একটা পদ্মফুলের রিং। দীপার জ্যাঠামশাই আর কাকা কী করবেন ভেবে পাচ্ছেন না। ধিতিং ধিতিং করে নাচছেন। সাধারণ আত্মীয়স্বজনরা ছিটকে সরে যাচ্ছেন। কাকা ইংরেজিতে বলছেন, ক্লিয়ার আউট, ক্লিয়ার আউট। জ্যাঠামশাই বলছেন, ভিড় হাটাও, ভিড় হাটাও।

মেয়র মৃতদেহ স্পর্শ করবেন না। ইনফেকশনের ভয় আছে। সঙ্গের একজনকে ইশারা করলেন। তিনি ফুলের রিংটা মৃতদেহের বুকের উপর রাখলেন। মেয়র একটা নমস্কার করে বললেন, 'যথেষ্ট বয়েস হয়েছিল।'

সবাই বললেন, 'তা ঠিক, তা ঠিক।'

'এরপর আর বাঁচা উচিত নয়।'

'অবশ্যই নয়, অবশ্যই নয়।'

'আই লাইক টু ডাই ইয়াং।'

ভদ্রলোক হয়তো যাটে পৌঁছেছেন। ভাবছেন ইয়াং। আহারাদি ভালোই হয়। রাতের দিকে দু পাত্তর স্কচ চড়ান। পার্টি পেছনে আছে। এত বড় একটা শহরের মালিক। যুবক তো বটেই। তাঁর এই ডাই ইয়াং শুনে সবাই হয়ে হায় করে উঠলেন, 'মরবেন কী স্যার। আপনার মতো মানুষের অমর হওয়া উচিত। জনগণ আপনাকে চায়।'

মেয়র বললেন, 'সেটা কোনো কথ নয়। চায় বলেই যে বাঁচতে হবে এমন কোনো কথা নয়। আমার কথা, নড়বড়ে শরীরে বাঁচার কোনো মানে হয় না।'

সবাই বললেন, 'তা ঠিক, তা ঠিক।'

মেয়র কথা বলতে বলতে মার্বেল পাথর বাঁধান সিঁড়ি দিয়ে নামছেন। চামড়ার জুতো। স্লিপ না করে। চারজন বডিগার্ড সতর্ক। এদিকে সার্ভিস দিলে ওদিকে আসবে। মানুষটার কাছ থেকে কত কী বাগিয়ে নেওয়ার আছে। এতো মানুষ নয়, ভক্তবাঞ্ছা কল্পতরু।

দীপা একপাশে দাঁড়িয়ে সব দেখছে। বড়োলোকের কী খাতির। বড় পিসিমা রেগে চলে যাচ্ছেন। হাইপ্রেসার। ধাক্কা খেয়ে পড়ে গেলে কী হত। সেরিব্রাল অ্যাটাক। কে তখন দেখত আমাকে। মেয়র এসেছে তো কী হয়েছে। পিসেমশাই ঠান্ডা করার চেষ্টা করছেন, কাজের বাড়িতে এমন হয়। তোমার এই রাগটা একটু কমাও মান্তু।

এক ঝটকায় স্বামীর হাত সরিয়ে দিয়ে মান্তু বললেন, ওই জন্যই তো এই মড়াদের বাড়িতে আমি আসতে চাই না। নিজের বাপ, তায় আবার মারা গেছে, বলতে নেই তবু বলছি, কতগুলো জানোয়ারের জন্ম দিয়েছিল।

ছোটর বউ পাশ দিয়ে যেতে গিয়ে শুনে ফেলল। সাপ যেমন থমকে দাঁড়িয়ে ফণা তোলে সেইরকম ফোঁস করে উঠল, তার মধ্যে তুমিও পড় ঠাকুরঝি। তুমি যে কী সে তোমার স্বামী জানে।

আর তুই কী সে আমরা জানি ঢলানী মাগী। তোর গুণের তো ঘাট নেই। শ্বশুরের কোলে উঠে বসে থাকতিস।

আর তুই কী করতিস! ইলেকট্রিক মিস্ত্রীকে জড়িয়ে ধরে শুয়ে থাকতিস।

বুড়ো কত্তা ওদিকে খাটে কাঠ হচ্ছে, এদিকে দুই বাঘিনীর খামচাখামচি।

মেয়েরা ঝগড়া সূত্রপাতেই তুই আর মাগীতে যাবেই যাবে। আর সব অপরাধের সেরা হল যৌন অপরাধ। আর যত লুকিয়ে চুরিয়েই কর প্রকাশিত হবেই। অনেকটা চিকেন পক্সের মতো। ব্যাপারটার মধ্যে অন্য কিছু থাকলেও সেটাকে টেনে ওই একই লাইনে আনা হবে। আর দুজনের এই কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি দীপা শুনছিল। ভয় পাচ্ছিল। পৃথিবীটা বিশেষ সুবিধের জায়গা নয়। প্রশ্ন আসছিল মনে, এই কারণেই কী ঠাকুরদা কাকাকে একটু বেশি ভালোবাসতেন। জ্যাঠামশাই কী সেই কারণেই কাকিমার সঙ্গে কথা বলেন না। জ্যাঠাইমা কী সেই কারণেই কাকিমাকে সহ্য করতে পারেন না। দীপার মনে পড়ল, সে যখন আরো ছোটো ছিল, দেখত পিসিমার সঙ্গে একটা ছেলে আসত। ভালো চেহারা, কোঁকড়া চুল। পিসিমা কথায় কথায় তাকে আদরের চড় মেরে বলতেন, তুই থাম, আর জ্বালাসনি আমাকে। মেয়ে মহলে গবেষণা হত পিসিমার কেন ছেলেপুলে হল না। একটা কথা প্রায়ই শুনত, ঠাকুরজামাই ঢোঁড়া সাপ। ছোবল আছে বিষ নেই। দীপার মনে আছে পিসিমা খুব সাজতেন। গোড়ালিতে ঝামা ঘষতেন। দুধের সরের সঙ্গে কমলালেবু খোলা বেটে সারা শরীরে লাগাতেন প্রায় বিবস্ত্র হয়ে। রেশমের তৈরি বক্ষবন্ধনী পরে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে নিজেকে দেখতেন। সামনে খোলা জানলা। বাগানের কোণে সার্ভেন্টস কোয়ার্টার মালির ছেলের গোঁফ গজিয়েছে। সে হাঁ করে দেখছে।

সব কথা, উড়ো কথা, ছেঁদো কথা। কোথাও না কোথাও একটু সত্য থাকেই। দীপা দেখেছে কাকিমাকে পাশ বালিশ করে ঠাকুরদা শুয়ে আছে। খাটের পাশের টেবিলে খল, নুড়ি। চেটে চেটে মকরধ্বজ খেয়েছেন। ডিশে পড়ে আছে একটা, খাস্তা কচুরি। বৃদ্ধ আলুর দম দিয়ে খাস্তা কচুরি খেতে ভালোবাসতেন। কোনো কোনো মানুষ বয়েস বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে দেহে ফুলতে থাকেন। মনের দিক থেকে হয়ে ওঠেন পৈশাচিক। পয়সাঅলা লোকদের মধ্যে এটা খুব হয়। কারণ তাঁরা অধার্মিক। দেব-দেবীর পূজাঅর্চনায় ঘটা করেন ঠিকই, সে সবই বিত্তবাসনায়। আকাঙ্ক্ষা একটাই, ধনদৌলত। নিজের অন্তরে স্নিগ্ধ, পবিত্র দেবভাব জাগিয়ে তোলার উদ্দেশ্যে নয়। দীপার ঠাকুরদা ষাটের পর এইরকমই হয়ে গিয়েছিলেন। সিল্কের লুঙ্গি, কাঁধকাটা গেঞ্জি পরে বেতের একটা চেয়ারে বসে থাকতেন। বসে বসে কেবল ভোগের কথা বলতেন। মেয়েদের শরীর নিয়ে কথা বলতেন। বহুকাল আগে এ-পাড়ার কোথাও একঘর বেশ্যা ছিল, তাদের কথা বলতেন। আর মাঝে মাঝে দীপাকে আদর করার চেষ্টা করতেন। দীপা তখন পালাবার পথ পেত না। মেয়েরা শৈশব থেকেই বুঝতে শেখে কোনো আদরটা কেমন।

বেলা দশটা বেজে গেল, তখনো দীপার বাবা কিন্তু এলেন না। কলকাতার এক হোটেলে বসে আসেন অন্য জগতে। দীপা এখন বোঝে, ফেটাল ওম্যান কাদের বলে। বিষকন্যা, নাগিনী। কলেজে সে লুইসের 'দি মঙ্ক' বইটি পড়েছিল।

পাঠ্য হিসাবে নয়। পড়তে বাধ্য হয়েছিল তার ইংরেজির অধ্যাপকের অনুরোধে। ছোট্টখাট্টো হাসিখুশি মানুষটি। অনেকটা পাকা নারকোল কুলের মতো দেখতে। চকচকে উজ্জ্বল। একমাথা কালো কোঁকড়া চুল। ছেলে মেয়েদের সঙ্গে বন্ধুর মতো মিশতেন। কোনো কৃত্রিম গাম্ভীর্য ছিল না। দীপার সঙ্গে অদ্ভুত একটা বন্ধুত্বের সম্পর্ক তৈরি হয়েছিল। দীপা এখন বোঝে, সেই খোলামেলা, বালকস্বভাবের মানুষটিকে সে ভালোবেসেছিল। সবুজ মাঠের মতো, স্বচ্ছ জলে লুটিয়ে থাকা আকাশের মতো, ঝাঁকড়া একটা মহুয়া গাছের মতো। সেই কথাটা মুখ ফুটে বলতে পারেনি দীপা। লজ্জা করছিল। একজন অধ্যাপককে কী সেইভাবে ভালোবাসা যায়! সম্পর্ক যে গুরু-শিষ্যের। সেই অধ্যাপক ছিলেন অবিবাহিত। কলেজ স্ট্রিটের এক বনেদি বাড়ির তিনতলায় একা থাকতেন। দীপা প্রায়ই সেখানে যেত। লোহার খাটে গেরুয়া চাদর পাতা বিছানা। লাগোয়া ছাদে ছিল অ্যাসবেস্টারের ছাউনিতে একটা রান্নাগর ও বাথরুম পাশাপাশি। রান্নাঘরে অন্য কোনো রান্নার ব্যবস্থাই ছিল না। ছোট্ট একটা টেবিলে চায়ের সরঞ্জাম। হিটার, কেটলি, কাপ ডিশ, ছাঁকনি এইসব। কৌটোয় বিস্কুট, চানাচুর নিমকি। অকেনটা সন্ন্যাসীর আস্তানার মতো। ঘরে সব সময় বাতাবি লেবুর গন্ধ। খোলা ছাদে ব্যায়ামের সাজসরঞ্জাম, ডাম্বেল, বারবেল, মুগুর। অনেক সময় রামকৃষ্ণ মিশনের সন্ন্যাসীরা আসতেন। তখন বেদ, বেদান্ত, উপনিষদ, গীতার চর্চা হত। স্বামীজি, ঠাকুরের নানা প্রসঙ্গ। দীপা মেঝেতে বিছনো দড়ির কার্পেটে বসে মুগ্ধ হয়ে শুনত। ওইসব আলোচনা তার ভীষণ ভালো লাগত। মনে হত অন্য জগৎ থেকে ভিন্ন একটা বাতাস ভেসে আসছে। নীচে কলেজ স্ট্রিটের ডাবপট্টির হইচই। কিছু উপরেই মশগুল অধ্যাত্মিক প্রসঙ্গ। একই বেঁচে থাকার কত প্রবাহ।

বন্ধুর মতো সেই অধ্যাপক রোমান্টিক অ্যাগনি বোঝাতে গিয়ে দীপাকে বইটি দিয়েছিলেন বাড়তি পাঠ্য হিসাবে। এক সাধুর পতনের কাহিনি। জীবকোষ কুরে কুরে খায় কামনার কীট। সুতো যদি কারো লাটাইয়ে থাকে, সে-লাটাই ধরা আছে রিরংসার হাতে। ও তার নড়াচড়া, ওঠাবসা, সবই সেই কামকুঞ্জে। সর্বনাশা আকর্ষণ তার। গভীর রাতে সেই কাহিনি দীপা পড়েছিল বিছানায় আধশোয়া হয়ে। নায়িকার নাম, মাটিল্‌ভা। নায়কের নাম সন্ন্যাসী অ্যামব্রোসিয়া। ঘটনাস্থল একটি আশ্রম। অ্যামব্রোসিয়ার আশ্রমে মাটিল্‌ভা এসেছিল বৈরাগী, সমাজসেবিকার রূপে। ধরা যায়নি তার আসল রূপ। কত প্রশংসা তার। নিঃস্বার্থ সেবিকা সুন্দরী। দিন যায়, সে তার প্রলোভনের জালে জড়াতে চায় আদর্শবাদী সন্ন্যাসীকে। তুমি ত্যাগী, চরিত্রবান, সংযমী। তোমাকেই আজি জয় করব। মাকড়সার জালে পতঙ্গের মতো। তোমার প্রতিরোধের দুর্গ ভেঙে যাবে। সেদিন ছিল চাঁদের আলোর রাত। আশ্রমের একটি গ্রামীণ ঘর। কালো পাথরে দুধের

মতো লুটিয়ে আছে চাঁদের আলো। মাটিলভা বলছে, এসো আমাদের বাহুবন্ধনে। ইন্দ্রিয়ের সেবাই পাশব ধর্ম। নিগ্রহ এক মানসিক ব্যাধি। নদী জানি যাবেই চলে সাগরের পানে। ঝিমঝিম নিশুতি রাত। পুরনো ফার্নিচারে ঘুণ পোকার শব্দ। দূরপ্রান্তরে শেয়ালের ডাক। গির্জার নিঃসঙ্গ চূড়ায় রাতের আকাশ। বাতাসে শীত। পাহাড়ের মাথায় বরফের কিরীট। যুবক সন্ন্যাসীর প্রতিরোধ, তুমি চলে যাও, এ আমার পথ নয়। আমি নিষ্পাপ, নিষ্কলঙ্ক সন্ন্যাসী।

সুন্দরী নায়িকা বলছে, সন্ন্যাসী। আমার হাতে কী দেখেছ?

চাঁদের আলোয় ঝিলিক মারছে চকচকে ছুরি। তুমি যদি প্রত্যাখ্যান করো, এই ছুরি আমি আমার বুকে বসাব। ফড় ফড় করে সে তার নানের পোশাকের বুকের দিকটা ছিঁড়ে ফেলল। বর্তুলাকার বুকের আধখানা ছিটকে বেরিয়ে গেল।

লেখক বর্ণনা দিচ্ছেন। চকচকে ছুরির ফলা বাতাবি লেবুর মতো বাঁদিকের বুকে ঠেকান। উঃ সে কী বুক! এই হল নারীর স্তন। চাঁদের আলো সোজা সেই বুকে এসে পড়েছে। সেই ঝকঝকে সাদা বুকের দিকে তাকিয়ে সন্ন্যাসী স্তম্ভিত। ঈশ্বর কী তার চেয়ে অন্য কোনো সৌন্দর্যের সন্ধান দিতে পারেন। শরীর মুচড়ে দিতে পারে অন্য কোনো এমন বস্তুর। চোখ ফেরাতে পারছে না। তৃষ্ণা, আগ্রহ, আবেগ। একটা ক্ষীণ কণ্ঠস্বর শোনা যাচ্ছে, ছিঃ ছিঃ, তুমি সন্ন্যাসী। প্রলোভন, দেহবাসনা, পাপ, তাকিও না। কিন্তু আনন্দ। এ কী আনন্দ। সারা অঙ্গ-প্রত্যঙ্গে আগুন। ধমনীর রক্ত টগবগ করে ফুটছে। চোখে আগুন। বহুতর পাশবিক কামনায় শরীর কাঁপছে। মাত্র আড়াই হাত দূরে সেই লোভনীয় প্রলোভন চাঁদের আলোয় ধকধক করছে। সন্ন্যাসী হঠাৎ আর্তনাদ করে উঠলেন, 'দাঁড়াও। আমি আর নিজেকে ধরে রাখতে পারছি না। মোহিনী। তুমি দাঁড়াও, আমার সর্বনাশের জন্য তুমি দাঁড়াও।'

সন্ন্যাসী সেই সুন্দরীর ক্রীতদাসে পরিণত হলেন। আমি বলছি, তুমি কর। পাপ কর, ধ্বংস হয়ে যাও, সংসার, ঈশ্বর, সম্পর্ক সব ধুস। ইন্দ্রিয়ই একমাত্র সত্য। অপরাধেই বাঁচার উত্তেজনা। যে-অভিনেত্রীর ফাঁদে দীপার বাবা ধরা পড়েছিলেন সেই মহিলা ওই ম্যাটিলভার মতোই। রূপালি পর্দায় দীপা তাকে দেখেছিল। ভয়ঙ্কর একটা শরীর, অভিনয় যেমনই হোক। দীপা জানে, সত্য একটাই, দেহ, ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের দাসত্ব। ছেলে, মেয়ে, দাদা, বউদি, কিছুই কিছু নয়। আমি খাব, আমি পরব, আমি রমণ করব, আমি অসুস্থ হব, আমি মরে যাব। এর বাইরে যা কিছু সব ভণ্ডামি। ওই যে অধ্যাপক, তিনিই বা কেন বইটা পড়তে দিয়েছিলেন দীপাকে। কোনো প্রয়োজন ছিল কী। তিনি পড়েছেন। পড়ার পর সেই চোখে দীপার দিকে তাকাচ্ছেন। সে এক ভয়ঙ্কর অস্বস্তি। অমন করে কী দেখছেন? প্রশ্নটা মুখের উপর করা যায় ন। কিন্তু প্রশ্নটা আসে।

দীপার বাবা এলেন সম্পত্তির ভাগ বুজে নিতে। না, একান্নবর্তী পরিবার আর

নয়। যে যার স্বাধীন। এমনকী, ব্যবসাও ভাগ করতে হবে। আমার আমার, তোমার তোমার।

জ্যাঠামশাই বোঝাতে চেয়েছিলেন, তুমি ধ্বংস হবে।

—তুমিও বাঁচবে না।

—নিজেদের মধ্যে প্রতিযোগিতা বাড়িয়ে কারো মঙ্গল হবে? তুমি বরং তোমার শেয়ারটা আমাকে বিক্রি করে দাও। এই মাল খালাসের ব্যবসা তোমার ধাতে সইবে না।

দীপার বাবা টোপটা গিললেন। মাথায় তখন সিনেমা নাচছে। পরামর্শদাতা অনেক। দীপার বড়ো মামা এসে বললেন, মনে কর, তোর বাবা-মা দুজনেই মারা গেছে। তুই আমার সঙ্গে চ। দেখি তোকে মানুষ করা যায় কি না। এই তাসের বাড়ি এইবার ভাঙবে।

কলকাতার বন্দরে বড়ো জাহাজ আর তেমন ভিড়ছে না। আমদানি, রপ্তানি কমছে। ইংরেজ আমলের সেই বিপুল বোলবোলা আর নেই। ফিরবেও না কোনোদিন। দক্ষিণে নতুন নতুন বন্দর তৈরি হয়েছে। বড়ো জাহাজ সব ওই দিকেই ভিড়বে। এদিকে শুধু ইন কিলাব হবে।

দীপার জ্যাঠামশাই আর কাকা একটু আদিখ্যেতা করলেন লোক দেখানো। আসলে সবাই খুশি। বাপ আর মেয়ে দুজনেই ছাঁটাই। একটা চরিত্রহীন, আর একটা মা মরা আদুরি। পরের দায়িত্ব কে ঘাড়ে নেবে। কলাগাছের মতো চড় চড় করে বাড়ছে। বখাটেরা তাকাতে শুরু করেছে। মায়ের মতো শরীর পেয়েছে, এখন বাপের মতো স্বভাবটা পেলেই হয়েছে আর কী। কে সামলাবে।

এইসব কথা প্রকাশ্যেই হল। যাও বাছা, বাপের সিনেমায় এইবার বুক খুলে নাচ। লায়িকা হও। বড়ো মামার হাত ধরে দীপা চলে এল মামার বাড়ি। দুই মামা। দাদু, দিদিমা। মামারা খুব মজার মানুষ। কারবারি. কিন্তু শিক্ষিত। গিরিডি আর কোডর্মায় মাইকার কারবার। পয়সার অভাব নেই। দুই ভাইয়ে খুব মনের মিল। বারগণ্ডায় বিশাল বাড়ি। ছবির মতো বাগান, লন। দীপা যেন প্রকৃতিতে মুক্তি পেল। মুক্তি পেল সুস্থ জীবনে। বোতল নেই, গেলাস নেই, সিল্কের লুঙ্গি নেই, স্যান্ডো গেঞ্জি নেই। মাংসল দেহ নেই। খিস্তি, খেউড় নেই। সদা হাসি, খুশি শান্ত একটি পরিবার। বড়ো মামার মেয়ে তুলি ছিল দীপারই সমবয়সী। সব সময় হেসেই আছে, ফুলে মতো ফুটেই আছে, শুকোতে জানে না। শিশিরের মতো দুটো চোখ। বড়ো মাইমা সব সময় সেজেগুজে থাকেন, একেবারে টিপটপ। বাড়িটার কোথাও এতটুকু ময়লা নেই. দুর্গন্ধ নেই। মাছের কাঁটা পিঁপড়ে টেনে নিয়ে যাচ্ছে, ইঁদুরে মাংসর হাড় নিয়ে ধস্তাধস্তি করছে, এ দৃশ্য চোখে পড়ছে না। প্রকাশ্য তারে ফাঁদাল শায়া বাতাসে ফুলে ফুলে উঠছে না। যেমন তেমন ভাবে ব্যবহৃত বাথরুমে মেয়েদের ছেঁড়া বুকের মতো বক্ষবন্ধনীর

ঝুলে থাকা অসভ্যতা নেই। মামার বাড়িতে এসে দীপা ধরতে পারল তার মনের সংস্কারটা কী। সে বৈষ্ণব। শান্ত, দাস্য, সখ্য, মধুর এই চারটি ভাব তার মনে বাসা বেঁধে আছে। সে চায় মধুরকে। রাক্ষস স্বভাবের মানুষকে সে ঘৃণা করে। পৈশাচিক পরিবেশে তার প্রবল ভয়।

দীপার মেজমামা ছিলেন আর এক সুন্দর মানুষ। গিরিডির নামকরা ডাক্তার। সাংঘাতিক প্র্যাকটিস। নাওয়া-খাওয়ার সময় নেই। তিসরি আর তার আশপাশের কয়লা ও মাইকামাইনসের শ্রমিকরা ভিড় করে থাকে। গলায় স্টেথিস্কোপ ঝুলিয়ে ডাক্তার ছুটে বেড়াচ্ছেন। টাকা-পয়সা কে কী দিচ্ছে খেয়ালই নেই। মাঝে মাঝে মনের আনন্দে শিস দিতেন। ফাঁকা মাঠ পেলেই এক রাউন্ড ছুটে নিতেন। বলতেন, বাছুরের আনন্দ, ছাগল ছানার নাচ, বাচ্চা কুকুরের দুষ্টুমি, এই তিনটেকে এক করে নিজেকে ভিতরে ঠিক ঠিক আনাটাই হল সাধনা। পয়সায় কী হয়। গুচ্ছের খাওয়া হয়। তারপর বাথরুমে নামিয়ে দিয়ে আসা হয়। আনন্দই হল জীবের শ্রেষ্ঠ খাদ্য। থেকে থেকে চিৎকার করে গেয়ে উঠতেন,

আকাশভরা সূর্য-তারা, বিশ্বভরা প্রাণ
তাহারি মাঝখানে আমি পেয়েছি মোর স্থান,

বড়ো মাইমা আর মেজমাইমাকে মনে হত দুই বোন। দিদি, দিদি, বলে সর্বক্ষণ পেছন পেছন ঘুরত মেজ। বড়র অনুমতি ছাড়া কিছু করত না। দুজনের মিল দেখে দীপা ভীষণ আনন্দ পেত। পৃথিবীর ভালো দিকটা দেখতে কী ভালো লাগে।

একটা আস্তাবল ছিল বিরাট। তিনটে তাগড়া ঘোড়া। চেস্টনাট ব্রাউন কালার। বড়ো মামা সেই ঘোড়ায় চড়ে দূর পাহাড়ের খনি অঞ্চলে চলে যেতেন রোজ সকালে। দুটো গাড়িও ছিল, একটা জিপ, একটা মটোর। দীপা নরক থেকে স্বর্গে এল। তার দাদামশাই কেন ওই বাড়িতে মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। পয়সা দেখে, পয়সা ছাড়া ওদের আর কী আছে। যে বাড়িতে একটাও বই নেই সে বাড়ি কেমন বাড়ি। মা তার মরে বেঁচেছে।

বড়ো মামা মেজ মামাকে বললেন, দীপাকে কীভাবে মানুষ করা যায়। ওর তো মনে ভীষণ দুঃখ।

—কীসের দুঃখ?

—মা নেই, বাবা থেকেও নেই। এটা একটা কম কথা।

—আমরা সবাই কী করতে আছি। ওকে আমরা ডাক্তার করব।

—ওর মতো কোমল, ভাবুক মেয়ে ডাক্তার হতে পারবে না, ওকে আমরা অধ্যাপিকা করব।

—আমার লাইনটা তাহলে লোপাট হয়ে যাবে।

—তোর ছেলে হলে, ছেলেকে ডাক্তার করবি।

—কবে হবে তার ঠিক নেই।

দীপার মনে আছে, টুকটুকে ফর্সা মেজমামা কাঁচা শাকসবজি, খোসা সুদ্ধ ফলপাকড় কশমশ করে চিবিয়ে খেতে খুব ভালোবাসতেন। তিনি মশমশ করে শশা খেতে খেতে আস্তাবলের দিকে চলে গেলেন। দুঃখ, দুঃখ মুখ। পাঁচ বছর বিয়ে হয়েছে কোনো ছেলেপুলে হয়নি। সেই কারণেই দীপাকে আঁকড়ে ধরতে চান। মাইকা মাইনে তখনো অনেক সায়েবসুবো। ব্যবসা সূত্রে এই পরিবারের সঙ্গে তাদের খাতিরও যথেষ্ট। দীপাকে বিলেত পাঠিয়ে স্পেশ্যালিস্ট ডাক্তার করিয়ে আনতে পারলে আর কোনো ভাবনা থাকবে না। এখনো সময় আছে যা পারার করে নাও। অ্যায়সা দিন নেহি রয়েগা। হঠাৎ মনে হল, কোনো ভবিষ্যতের কথা ভাবছি। দীপা বড়ো হবে, তবে তো। ততদিনে বাঙালি শেষ হয়ে যাবে। সময় খুব নিষ্ঠুর।

দীপার আলাদা ঘর। পেছনের বারান্দায় দাঁড়ালে সীমানার ওপারে খোলা জমি দুহাত তুলে ছুটে চলে গেছে পরেশনাথ পাহাড়ের দিকে। শাল আর শাল মহুয়ার জঙ্গল। লাল কাঁকর। হঠাৎ কোথাও বিশাল একটা পাথর। পাহাড়তল্লাট ছেড়ে সমতলে বেড়াতে এসে আর ফিরে যেতে পারেনি। দূর থেকে কে যেন ডাকে, দীপা।

মুক্তির ডাক।

দাদুর কাছে বসে রাতের বেলা দীপা বাঙালির গল্প শোনে। একশো বছরের পেছনের ইতিহাস। দাদুর ধবধবে সাদা চুল দাড়ি। বড়ো বড়ো উজ্জ্বল চোখ। সাদা পাঞ্জাবি। রূপকথার মানুষ যেন। মধুপুর থেকে গিরিডি আসার ব্রাঞ্চ লাইন পাতা হল ১৮৭১ সালে। সেই কাজের ঠিকাদারি পেয়েছিলেন হুগলি জেলার গোষ্ঠ কুণ্ডু। প্রকৃতির প্রেমে পড়লেন কুণ্ডুমশাই। তেমনি জলের গুণ। নির্মল বাতাস। গোষ্ঠবাবু গিরিডিতে জমিদারি কিনে ফেললেন। মধুপুরেও কিনলেন। এই ছোটনাগপুর অঞ্চলটার একটা মায়া আছে। মানুষকে বড়ো টানে। সন্ন্যাসিনীর মতো সুন্দরী। অবাঙালিরা এই গোষ্ঠবাবুকে বলত, 'বাবু তো বাবু গোষ্ঠবাবু। ১৮৮২ সালে একদল জার্মান এলেন। তখন তো জানাজানি হয়ে গেছে, গিরিডির মাটির তলায় সম্পদ আছে, তামা মাইকা উঁচু জাতের কয়লা। জার্মান সায়েবরা খোঁজ খোঁজ করে বারগান্ডায় খুঁজে পেলেন তামা। খোলা হল 'বারগান্ডা কপার করপোরেশন'।

দাদুর কাছে সেকালের গল্প শুনতে তার আরো ঘন হত। কল্পনার চোখে তৈরি হত অতীত চিত্র। দীপা সেই বিদেশিদের দেখতে পেত। শুনতে পেত পাথরে গাঁইতির শব্দ। বিদেশি বাংলোর লণ্ঠনের আলো। আদিবাসী রমণী। মহুয়ার গন্ধ। মাতাল ভালুক। আটবছর ধরে লোকসান দিয়ে নব্বই সালে জার্মান

সায়েবরা কারবার গুটিয়ে ফেললেন। লোকসানের কারণ, যোগাযোগের তেমন ভালো ব্যবস্থা নেই। পথঘাটের অভাব। তামা পরিশোধনের জন্যে যে প্ল্যান্ট দরকার তাও বসানো গেল না। এই নব্বই সালেই বাঙালিরা এলেন। কিনে ফেললেন, সায়েবদের যত বাংলো। এই বাঙালি সেটলমেন্টের নেতা ছিলেন, গিরিডির আদি বাসিন্দা তিনকড়ি বসু। তাঁরই আকর্ষণে বাঙালিরা ছুটে এলেন। তামার ব্যবসা যাঁরা কিনলেন তাঁদের নাম জে এন দে। জেন এন দের মেয়ে রেবা একজন নামকরা অভিনেত্রী।

এইসব শুনতে শুনতে দীপার চোখে ঘুম জড়িয়ে আসত। বাংলোটা তার দাদু কিনেছেন, সেটাও এক জার্মান সাহেবের ছিল। অনেকটাই অদলবদল করা হলেও, আদলটা বিলিতি। বড়ো বড়ো ঘর, টানা বারান্দা। ঘোরাফেরা করলেই মনে হয় বেশ উদার। কোনো সঙ্কীর্ণতা নেই।

দাদু খুব মিষ্টি করে বলতেন—দিদি ভাই, তোমার খুব ঘুম পেয়েছে, চোখের পাতা ভিজে আসছে।

দীপা তার দক্ষিণের একানে ঘরে এসে শুয়ে পড়ত। পরিষ্কার বিছানা, ধবধবে মশারি। দক্ষিণের জানলা দুটো খোলা। শুয়ে শুয়ে ভাবত, দাদুর মতো সুন্দর মানুষ যেন হয় না। চোখের পাতা ঘুমে ভিজে এসেছে। সে কেমন। ঘুম কী কোনো তরল পদার্থ। এই দাদুর কাছ থেকেই দীপা পেয়েছিল কবির মন, ভাষা উপমা। নারকোল গাছের ঝিরিঝিরি পাতার মতো চোখের পাতা। নারকোল গাছের পাতায় যখন চাঁদের আলো পড়ে অনেক জ্যোৎস্নার রাত। তখন মনে হয় যেন ভিজে গেছে। চাঁদের আলো যেন তরল দুধ।

জানলার দিকে পাশ ফিরে আকাশ। আকাশের গায়ে আঁকা মহুয়ার টোপা টোপা পাতা। ফুলের গন্ধ নাকে নিতে নিতে, অদ্ভুত অদ্ভুত সব কল্পনায় ভাসতে ভাসতে দীপা চলে যেত ঘুমের দেশে। ঘুমের কোনো দেশ আছে? অবশ্যই আছে। মানচিত্রে মিলবে না। কিন্তু জল আছে, স্থল আছে, আছে কানন-পাহাড়। বিছানায় শুয়ে ঘুমে তলিয়ে যেতে যেতে দীপার মনে হত, এই সময় কোনো নরম শরীর যদি তাকে জড়িয়ে ধরত। নরম শরীরের উষ্ণতা। পিঠের কাছে নরম একজোড়া বুকের ভারি শ্বাস-প্রশ্বাসের ওঠাপড়া। নরম একটা জানুর তার কোমরের কাছে চেপে বসা। তার বুকের কাছে লেগে থাকা নরম একটা হাত। মুক্ত যেমন ঝিনুকের শ্লেষ্মার আবরণে মাখামাখি হয়ে থাকে, রাতের নির্জন অন্ধকার কোলে সেইভাবে থাকা ঘাড়ের কাছে খোঁপার নীচে ঠেকে থাকা একটা নাকের নরম নিঃশ্বাস। এই নেশাটা ধরিয়ে দিয়ে গেছে সেই মহিলা, যে তার ঠাকুরদার সেবা করত কলকাতার বাড়িতে। সাদা ব্লাউজ, সাদা শাড়ি। শরীরে ওষুধের গন্ধ। ঘামের ঘন্ধ, চুলের গন্ধ। কী একটা মশলা চিবতো, মুখে সেই মশলার গন্ধ। পুরু দুটো ঠোঁট। জোড়া ভুরু। অন্ধকার কাল চোখ। সেই দেহের

আলিঙ্গন, উত্তাপে দীপার শরীর ঘেমে উঠত। সে পাশ ফেরার সময় দীপাকে জড়িয়ে ধরেই পাশ ফিরত। দীপা তার শরীরের উপর দিয়েই এপাশ থেকে ওপাশে চলে যেত। সে তার পিচ্ছিল ত্বকে হাত বোলাতে বোলাতে বলত, তোর স্কিন সিল্কের মতো। তোকে ছেড়ে আমি থাকব কেমন করে। এই কথা বলে সে পাগলের মতো আদর করত। তখন তাকে মনে হত নারী-পুরুষ। বিছানার চাদর কুঁচকে যেত। বালিশ ছিটকে চলে যেত খাটের বাইরে। সেই আদরের হাতে দেহ-সমর্পণ করতে দীপার খুব ভালো লাগত। মনে হত সবটাই অন্যরকম। স্বাভাবিক নয়। একটু ভয়ের; কিন্তু খুব মজার, ভীষণ আরামের।

এই একলা ঘরে, সাদা বিছানায় শুয়ে দীপার সেই অভাব বোধটা ফিরে আসত। একটা আকাঙ্খা। এপাশ ওপাশ করতে করতে একসময় ঘুম। পাশের ঘরেই মেজমামা। আলো জ্বলছে। কিছুটা ছিটকে গিয়ে লেগেছে গাছের পাতায়। অনেক রাত পর্যন্ত মেজমামা লেখাপড়া করতেন। দেশ-বিদেশের ডাক্তারি ম্যাগাজিন বই। এই অঞ্চলের মানুষের সাধারণ চিকিৎসায় এতটা জ্ঞানের প্রয়োজন হয়তো ছিল না। কিন্তু জ্ঞানের স্পৃহা ছিল অসীম। মানুষের শরীরই তো জটিল এক দর্শন। অদ্ভুত সব ভাবনা আসত। অনেক সময় উদ্ভট।

এমন যদি হত, হঠাৎ কোনো ভাইরাসের আক্রমণে মানুষের বাইরের আবরণটা হয়ে গেল কাঁচের মতো স্বচ্ছ গ্লাস কেস। ভাইরাসটার নাম যদি হয় ফ্লোরেসেন্ট ভাইরাস। ডাক্তার ধীরে ধীরে কল্পজগতে প্রয়াণ করতেন। দুহাত দূরে বিছানায় অকাতর ঘুমে তার সুন্দরী, শিক্ষিতা স্ত্রী। ট্রান্সপেরেন্ট। ডাক্তার তার অ্যানাটমির জ্ঞান নিয়ে দেখতে পাচ্ছে। কালচে লাল, থলথলে একটা হৃদয় থির থির করছে। একাধিক আবরণে আবৃত। আবরণের পাটে পাটে এক ধরনের তরল পদার্থ। বুকের খাঁচার ভিতর একটু তেরছা করে আটকান। তলায় পর্দা উপরে আবরণ। দিন নেই রাত নেই ধক ধক করে চলেছে। ভাঁজে ভাঁজে জমে থাকা তরল পদার্থ যেন তেলের কাজ করে। পিচ্ছিল, হড়হড়ে করে রেখেছে। ওঠাপড়ার সময় আটকে না যায়। মুষ্টিবদ্ধ হাতের মতো। পাঁচ ইঞ্চি লম্বা, সাড়ে তিন ইঞ্চি চওড়া। মেয়েদের হার্টের ওজন আট আউনস, ছেলেদের দশ আউনস। চারটে নল আটকান।

সেই নলের চেহারা মোটেই সুদৃশ্য নয়। কিড়িকিড়ি। রিং রিং। সারা শরীর ভ্রমর করে রক্ত হার্টে ঢুকছে। স্বচ্ছ মানুষের স্বচ্ছ আবরণের অন্তরালে শরীরের যাবতীয় যন্ত্রপাতি দৃশ্যমান। একটা ভয়। এসব কী! মানুষের নিয়ন্ত্রণের বাইরে। দিবারাত্র কাজ করে চলেছে। হার্টের দুপাশে ঝিল্লির আচ্ছাদন দুটো ফুসফুস। বিচিত্র দর্শন দুটো বেলুনের মতো। গাছের শিকড়ের মতো শিরা উপশিরা জড়িয়ে আছে। শ্বাস-প্রশ্বাসের নিয়মিতো ছন্দে ফুলছে আর চুপসে যাচ্ছে। রক্তকণিকায় মিশছে প্রয়োজনীয় অক্সিজেন। অক্সিজেন সমৃদ্ধ রক্ত লক্ষ লক্ষ

শিরা উপশিরার পথ ধরে শরীরের বিভিন্ন খণ্ডে ছুটে চলেছে। ডাক্তার তাঁর ঘোর লাগা চোখে দেখতে পাচ্ছেন। গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, কাবেরী, নর্মদা, গোদাবরী। কলস্বিনী রক্তনালিকা। মূল স্রোতধারা থেকে বেরিয়ে আসছে সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ধারা। বাহিকা। নীল ধমনী। মিনিট ষাট থেকে আশি, এই হল হৃদয়ের স্পন্দন ছন্দ। সেকেন্ডে একবার অথবা একের একটু বেশি। একবার ধক করা মানেই একশো তিরিশ কিউবিক সেন্টিমিটার রক্ত হৃদয় থেকে বেরিয়ে গেল। তার মানে মিনিট পাঁচ লিটার রক্ত পাম্প করছে হার্ট। একজন মানুষ যদি একশো বছর বাঁচে, তা হলে এই বিশ্বস্ত ক্ষুদ্র পাম্পটি ছ'লক্ষ টন রক্ত টানবে আর ছাড়বে। চল্লিশ কোটি হবে স্পন্দন সংখ্যা। ডাক্তার নিজেই ঘাবড়ে গেলেন। বুকের বাঁপাশে বসে আছে এক অবিশ্বাস্য শক্তিশালী যন্ত্রটি। সারাদিন ঘুরছি ফিরছি, অথচ একবারও খেয়াল হচ্ছে না। কে চালায়, আমি চলি বা কেন। হৃদয় কী ভয়ঙ্কর শক্তি তোমার। পঁয়ত্রিশ সের ওজন মাটি থেকে একফুট তুলতে আমার মাংসপেশীকে যে-শক্তি খরচ করতে হয় সেই শক্তি তুমি প্রতি মিনিটে প্রয়োগ করছ। আমার হাত আর পায়ের পেশির শক্তির চেয়ে তোমার শক্তি দ্বিগুণ বেশি। আমি ক্লান্ত হব কিন্তু তুমি অক্লান্ত কর্মবীর। তোমার শক্তির উৎস আজও খুঁজে পায়নি শরীর তত্ত্ববিদ।

মেজমামা গভীর রাত পর্যন্ত নিজের ঘরে বসে বসে কী করেন দীপা জানে না। মেজমাইমাও জানেন না। ঘুমোতে ঘুমোতে মাঝে মাঝে চোখ খুলে বলেন, "এ কী এখনো আলো জ্বলছে, তুমি শোওনি। কী করছ কী এখনো?"

—তুমি ঘমোও, আমাকে বুঝতে দাও, হোয়াই আই ব্রিদ। কে আমাকে প্রথম প্রভাতে বলেছিল, বাছা শ্বাস নাও। এই আমি চালিয়ে দিয়ে গেলাম। ইচ্ছে থাক আর না থাক, এ চলবে। শ্বাসই জীবন। আমিই আবার একদিন বন্ধ করে দিয়ে যাব। তখন তোমার ধমনীতে আর এক ফোঁটাও রক্ত থাকবে না। শূন্য। তাজ্জব কী বাত। কোথায় গেল সব রক্ত।

—তুমি বসে বসে ওই সব ছাইপাঁশ ভাব, আমি ঘুমোই।

—সেই ভালো। জানলেই তুমি পাগল হয়ে যাবে।

প্রাচীনকালের শরীরতত্ত্ববিদদের কথা মনে পড়ে গেল ডাক্তারের। কবর থেকে মৃতদেহ তুলে এনে ফালাফালা করে দেখছেন কোথায় কী আছে। সাধারণ মানুষের চোখে তাঁরা পিশাচ। মৃতদেহ কেটে তাঁরা শরীরের ছবি তৈরি করছেন, অ্যানাটমি। হাড়ের খাঁচার রহস্য সন্ধান করছে। মাইকেল এঞ্জেলো স্কেচবুকে নকশা আঁকছেন। অধ্যাপকের গোপন ঘরে কঙ্কাল ঝুলছে। কতিপয় ছাত্র। তারা কঙ্কালতত্ত্ব বোঝার চেষ্টা করছে। মৃত মানুষের ধমনীতে রক্ত নেই দেখে তাঁরা সিদ্ধান্ত করলেন, জীবন্ত মানুষের এই নালিকায় বাতাস থাকে। এর নাম রাখ আর্টারি। পরে যখন জ্ঞান আরো এলো, জানা গেল, না, ধমনী হল এক একটি

রক্ত নদী, তখন কিন্তু নামটা আর বদলান হল না। এয়ার ট্র্যাক্ট, আর্টারিই রয়ে গেল। ডাক্তার আর ভাবতে চাইলেন না। শুয়েই পড়ি বলে স্ত্রীর পাশে এসে শুয়ে পড়লেন। পাশ ফিরে শুয়ে আছে রমণীর একটি নারী দেহ। গৌরবর্ণ ত্বক। তার তলায় একপুরু মেদ, মাংসপেশী। শিরা, ধমনী, কঙ্কাল। এর কোথায় আছে প্রেম, প্রীতি, সৌন্দর্যবোধ। এ তো একটা যন্ত্র। তবু কেন তোমাকে এত ভালোবাসি। মানুষ কী তা হলে মানুষের ভিতরে নেই। মানুষের অনুভূতি কী বাইরে আছে।

নিশীথ রাতের আকাশে। নদীর বুকের উপর দিয়ে বহে যাওয়া বাতাসে। স্ত্রীর চওড়া পিঠে হাত রেখে ডাক্তার শুয়েছিলেন। আবার উঠে বসলেন ধড়মড় করে। তাকিয়ে আছেন দেয়াল ঘড়িটার দিকে। ঘড়িতে কী সমস্যার সমাধান আছে। প্রশ্ন আছে। মহা প্রশ্ন। সময় কোথায় আছে। ঘড়ির ভিতরে, না বাইরে। ঘড়ির কাঁটা দুটো আর ডায়ালের অক্ষরগুলো খুলে নিলে কী হয়। নির্বোধ টিক টিক। স্প্রিং, পিনিয়ন, হুইল, ব্যালেন্স। একটা যন্ত্রমাত্র। সময় তো আছে মহাকালের স্রোতে। সময় আছে মানুষের বেঁচে থাকার বোধে যন্ত্র, কাঁটা, অক্ষর তিনের মিলনে সময়। ভাষাতে কী মনের ভাব প্রকাশ পাবে যদি না বোধ দিয়ে সাজান যায়। যদি বলি, গেলাস, পাথর, মেঘ, পাহাড়, জল। কিছু বোঝা যাবে? বস্তুর নামরূপ। যদি বলি, পাহাড় কাঠ পাথরের গেলাসে মেঘের জল, তা হলে কত কী প্রকাশিত হল একই সঙ্গে। শব্দের পিছনে কণ্ঠযন্ত্র যন্ত্রমাত্র, বোধটাই সব। এই বোধ তো যন্ত্রে নেই। দেহযন্ত্রে জীবন আছে, অ্যাকশন, মোশন আছে। চেতনা কোথায় আছে, বোধ আর বোধি কোথায় আছে। জন্ম আর মৃত্যু তো মানব সভ্যতা নয়, যুদ্ধ, বিগ্রহ, সাম্রাজ্যের উত্থান পতন, সাহিত্য সংস্কৃতি নৃত্য, গীত সবই তো বোধের প্রকাশ। তা যদি না হত, তা হলে কীটেরও তো সভ্যতা তৈরি হত। নর্তকীর নৃত্য তার শরীরে আছে, না সবোধে মুদ্রায়। তাই যদি না হবে, তা হলে পিস্টনের ওটা পড়াকেও তো নাচ বলতে হয়।

একটা হাত ডাক্তারকে সস্নেহে বিছানায় টেনে নিল—'আর নয়, এইবার ঘুমোও। ভোর হয়ে এল। সারাটা দিন তোমার কোনো বিশ্রাম নেই।'

ডাক্তার স্ত্রীর কোলে ঢুকে যেতে যেতে ভাবছেন, এই কথাটা কে বলছে! একটা শরীর, যে শরীরের বর্ণনা আছো অ্যানাটমির পাতায়! না কখনই না? এর উৎস অন্য কোথাও। গঙ্গা একটা নদী, হিমালয় থেকে সাগরে দিকে ছুটে চলা জলধারা। আর দেবী! সুরেশ্বরী ভগবতীগঙ্গে, সেই গঙ্গা তো মানুষের বোধে। দীপার এই মেজমামা দিন দিন এক অসাধারণ মানুষ হয়ে উঠতে লাগলেন। কী যেন একটা খুঁজে বেড়াচ্ছেন! অর্থ, সম্মান, ভোগ, প্রতিপত্তি নয়। একটা উত্তর খুঁজছেন। রুগি দেখতে দেখতে ভাবেন, আমার কী করার আছে। যন্ত্র যিনি চালু করেছেন তিনিই বেঁধে দিয়েছেন আয়ু। যেদিন বন্ধ হবে সেদিন বন্ধ হবে।

ভিতরে কলকবজা কার নির্দেশে চলছে! তোমরা জান না, তোমাদের ভিতরে কী আছে! পেট একটা ল্যাবরেটারি, দুটো ফুসফুস তোমার হাপর, হার্ট শক্তিশালী এক পাম্প, কিডনি বিশাল এক ছাঁকনি, আর মস্তিষ্ক তোমার ব্রহ্মাণ্ড, ঘাড়ের পেছনে চেতনার 'কেব্‌ল লাইন'। এসব আমরা ডিসেক্‌ট করে জেনেছি; কিন্তু জানতে পারিনি প্রথম শ্বাস তুমি কার ইচ্ছায় নিলে। ডাক্তার রুগি দেখেন, ভিজিট নিতে পারেন না। কার ডাক্তারি কে করে!

ডাক্তারের কেবলই মনে পড়ে জেনেসিসের কাহিনি। হয়তো সেইখানেই আছে তাঁর প্রশ্নের উত্তর। এই জগৎকারণের পিছনে আছে এক ইচ্ছাশক্তি। লেট পেয়ার বিলাইট, অ্যান্ড দেয়ার ওয়াজ লাইট, অ্যান্ড ইট ওয়াজ গুড। মহা মহা অন্ধকার শূন্যে কে যেন ফিসফিস করে বললেন, তমসো মা জ্যোতির্গময়। আলো আমার আলো। আলোর ভুবন ভরে গেল। শতকোটি সূর্যের দীপ্তি। দিনের সূর্য, রাতের নক্ষত্র। জল, স্থল। সমুদ্র, নদী। প্রাণ, প্রাণী, লতাগুল্ম, স্থলচর, নভোচর। সৃষ্টির ষষ্ঠ দিবসে তৈরি করলেন শ্রেষ্ঠ জীব মানুষ। পৃথিবীর ধুলো থেকে পরম যত্নে। নিজের সামনে তাকে শোয়ালেন। তখনও নিষ্প্রাণ। দেন হি হিমসেল্‌ফ ব্রিদভ দি ব্রিদ অফ লাইফ ইনটু ইট। নাকের ছিদ্রপথ দিয়ে ঢুকিয়ে দিলেন প্রাণবায়ু। চোখ মেলে তাকাল প্রথম মানব। সেই এক আজ কোটি কোটি অনন্ত যাত্রাপথ।

দীপাকে বললেন, "এই নে পড়। জোরে জোরে। আমাকে শোনা।"

রবীন্দ্রনাথ। 'মহাস্বপ্ন'। দীপা পড়ছে, তিনি শুনছেন চোখ বুজিয়ে।

পূর্ণ করি মহাকাল পূর্ণ করি অনন্ত গগন,
নিদ্রাময় মহাদেব দেখিছেন মহান স্বপন।
বিশাল জগৎ এই প্রকাণ্ড স্বপন সেই,
হৃদয়সমুদ্রে তাঁর উঠিতেছে বিশ্বের মতন।
উঠিতেছে চন্দ্রসূর্য, উঠিতেছে আলোক আঁধার,
উঠিতেছে লক্ষ-লক্ষ নক্ষত্রের জ্যোতি-পরিবার।
উঠিতেছে, ছুটিতেছে গ্রহ উপগ্রহ দলে দলে,
উঠিতেছে, ডুবিতেছে, রাত্রিদিন আকাশের তলে।
একা বসি মহাসিন্ধু চিরদিন গাইতেছে গান,
ছুটিয়া সহস্র নদী পদতলে মিলাইছে প্রাণ।

দীপা দেখত মেজমামার চোখ বেয়ে জল নামছে। দেহ স্থির। সবটা শোনার পর চোখ চেয়ে বলতেন, বুঝলি, রবীন্দ্রনাথের সত্যদর্শন হয়েছিল। যত পড়বি, তত আনন্দ পাবি।'

মেজমামা দীপাকে ভীষণ ভালোবাসতেন। কোনও সময় কাছ ছাড়া করতেন না। বলতেন, 'তোর মধ্যে আমি একটা অন্য জগৎ তৈরি করে দিয়ে যাব। শুয়ে শুয়ে ভাববি, তোর গায়ে সবুজ ঘাস গজিয়েছে, বিশাল একটা গাছের শিকড়

তোর মধ্যে ছড়িয়ে পড়ছে। নদী বয়ে যাচ্ছে। সমুদ্রের ঢেউ আছড়ে পড়ছে। তুই হয়ে গেছিস আকাশ। সূর্য, চন্দ্র, নক্ষত্র ফুটে আছে সেই আকাশে।'

দীপাকে তিনি ভর্তি করে দিলেন রবীন্দ্রসংগীত শিক্ষার ক্লাসে। গিরিডিতে তখন বড়ো বড়ো মানুষের বাস। রবীন্দ্র বাতাস। ব্রাহ্মসমাজ। ব্রাহ্মমন্দির। উপাসনা। ঈশ্বরকে মানুষ তিনভাবে ধরতে চায়, গুণ সাকার, সগুণ নিরাকার, নির্গুণ নিরাকার। ব্রাহ্মবাদে তিনি সগুণ নিরাকার। অখিল বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের স্রষ্টা তুমি। মেজমামা দীপাকে নিয়ে ব্রাহ্মসমাজে যেতেন। তিনকড়ি বসু ছিলেন আদি বাসিন্দা। তিনিই গড়ে তুলেছিলেন এই বাঙালি উপনিবেশ। কলকাতা থেকে যে-সব বিশিষ্ট বাঙালি এখানে এসেছিলেন, তাঁদের অধিকাংশই ছিলেন ব্রাহ্মসমাজভুক্ত। নববিধান আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ দু'টি ভিন্ন উপাসনা মন্দিরের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। মেজমামা দীপাকে নিয়ে নববিধানে যেতেন। পরিবেশটা দীপাকে খুব মুগ্ধ করেছিল। মহুয়ার বাতাস। শাল, সেগুনের প্রহরা। বোগেনভেলিয়ার বর্ণ বিস্ফোরণ, গোলাপের আভিজাত্য। এই মাঝে সুসংযত, শিক্ষিত নারী-পুরুষের মিলন। সবাই স্ব-স্বক্ষেত্রে প্রতিষ্ঠিত। সারস্বত চর্চাই তাঁদের ধ্যানজ্ঞান। স্বয়ং রবীন্দ্রনাথ মাঝে মাঝে অবসর কাটাতে চলে আসতেন বারাগাণ্ডায়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকের সেই বোলবোলা দীপার সময়ে স্তিমিত হয়ে এলেও কিছুটা ছিল। মন্দির জীর্ণ। বাইরের দেওয়ালে সময়ের শ্যাওলা। উপাসনা কক্ষে ধুলো আর ঝুল। কাঠে আর পালিশের জেল্লা নেই। তবু মিলন। অতীতকে ধরে রাখার চেষ্টা। এইখানেই মাঘ মাসের সন্ধ্যায় একজনের সুরেলা কণ্ঠে দীপা শুনেছিল ব্রহ্মসংগীত। মোহিত হয়ে গিয়েছিল। মেজমামা কানেকানে বলেছিলেন, গানটির লেখক বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর। সেই সঙ্গীতের পথে দীপা এক অন্যজগতে চলে গিয়েছিল। যে-জগৎ ছিল তার মেজমামার, পরে দীপা ওই গানটি শিখেছিল সুরমাদির কাছ থেকে। ওই গানটাকেই সে করতে চেয়েছিল তার জীবনের টাইটেল মিউজিক।

অসীম রহস্য মাঝে কে তুমি মহিমাময়!
জগত শিশুর মতো চরণে ঘুমায়ে রয়।

এই গানের আসরে সময় পেলেই বড়োমামাও এসে যোগ দিতেন। সেজন্যই হয়তো চলে এসেছেন তাঁর অভ্রের কারখানা থেকে। সেখানে একটা বিশাল পালভারাইজার আছে। একপাশে একা দাঁড়িয়ে আছে খাণ্ডোলি পাহাড়। একটু দূরেই একটা লেক। নীলজলে ভাসছে আকাশের ছবি। সেখানে সারাদিন যন্ত্রে চূর্ণ-বিচূর্ণ হচ্ছে অভ্রের পাত। কারখানার বাতাসে ভাসছে অভ্রের রেণু। বড়ামামার চুলে, জামার চিকচিক করছে অভ্রের কুঁচি, যেন জড়োয়ার মানুষ। বড়ো বড়ো চুল। বড়ো বড়ো টানা টানা চোখ। জীবনের নেশা দুটো, অভ্র আর সাহিত্য। ইংরেজিটা ভীষণ ভালো জানেন। প্রবন্ধ লেখেন. রম্যরচনা লেখেন। গান ভালোবাসেন, ভালোবাসেন কবিতা।

বড়োমামা এলেই আসর যেমন আরও জমে উঠত। গানের সঙ্গে গলা মেলাবার চেষ্টা করতেন। গানের এক একটা লাইন শুনে, আহা আহা করে উঠতেন। ভাইয়ের দিকে তাকিয়ে বলতেন, 'কী রিয়েলাইজেসান দেখেছিস! বসে আছি পৃথিবীতে, তুলে নিয়ে যাচ্ছেন মহাবিশ্বে। রবীন্দ্রনাথ ইজ রবীন্দ্রনাথ।' মাথা হেঁট করে বসে থাকতেন। ভাবের ঘোরে দুলতেন। সারা শরীরে লেগে থাকা অভ্রের রেণু চিকচিক করত। মনে হত জীবন্ত দেবতা, এই মাত্র ভক্তের অঞ্জলি নিয়ে এসে বসেছেন। দুই মামা পাশাপাশি বসে আছেন। এ ওর গায়ে হেলান দিয়ে। এদিকে একের পর এক গান চলেছে। দীপার মাঝে মাঝে মনে হত, পৃথিবীটা কী সত্যিই এত সুন্দর! এত মিল, এত ভালোবাসা! দুই মাইমার একসঙ্গে ওঠা বসা। ঋষির মতো দাদু। ছবির মতো সাজান বাড়ি! সব কিছু ঝকঝক করছে, যেন এই মাত্র কেনা হল। নিখুঁত বাগান। লন। রোদ ছাতা। সব কিছু আছে, বেশি বেশি আছে, যত্ন নেই। কাজের লোকগুলি শয়তান। একটা এলোমেলো, বীভৎস, দুর্গন্ধী সংসার। লেখাপড়ার বালাই নেই। গান বাজনার ধার ধারে না কেউ। টাকা, খাওয়া, ঘুম আর ধুম ঝগড়া। দীপা একদিন দাদুকে জিজ্ঞেস করেছিল, অমন একটি বাড়িতে মায়ের বিয়ে দিয়েছিলেন কেন? দাদু স্বীকার করেছিলেন, "জীবনের হিসাব ওই একটা ব্যাপারেই ভুল হয়ে গিয়েছিল। পয়সাটাই দেখেছিলুম, কালচারটা দেখিনি।"

মেজমামা একদিন দীপাকে বললেন, "চল দীপা আজ তোকে একটা জায়গায় নিয়ে যাব। সেজেগুজে রেডি হয়ে নে। আমি গাড়িটা বের করে আনি।"

প্রথম শীতের মিষ্টি দুপুর। দীপা এসেছিল ছন্নছাড়া চেহারা নিয়ে। সেই চেহারায় লালিত্য এসেছে। চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়েছে। সে এখন হাসতে পারে, অভিমান করতে পারে। তার চারপাশে এখন ভালোবাসার অনেক লোক। মুখভার করে থাকলে তুলি এসে কাতুকুতু দেয়। মাইমারা ছুটে এসে জানতে চায় শরীর খারাপ কি না। দিদা এসে চুলের পরিচর্যা করেন। দাদু বলেন মজার মজার কথা। দীপা তার জীবনের মূল্য ফিরে পেয়েছে। দীপা দীঘল হয়েছে।

গাড়ি এসে গেল। দীপা সামনের আসনে মেজমামার পাশে গিয়ে বসল। প্রশ্ন করল, কোথায় যাবে। রাস্তার দু'পাশে বড়ো বড়ো নামকরা মানুষদের বাড়ি। হেরম্বচন্দ্র মৈত্রের 'কমল-আবাস'। উল্টোদিকে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের 'মহুয়া', সেকালের ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট সুরেশচন্দ্র সরকারের 'উপলাপথ'। ডাক্তার নীলরতন সরকারের 'মাঝলা কুঠি'। যোগীন্দ্রনাথ সরকারের 'গোল কুঠি'। এই 'গোল কুঠি'-র কাছে এলেই দীপার মনটা কেমন হয়ে যায়। সেই বিখ্যাত লেখক-হারাধনের দশটি ছেলে। কোন ছেলেবেলায় দীপা পড়েছিল। গাড়ি জনপদ পেরিয়ে ফাঁকা মাঠে এসে পড়ল। বড়োমামা বেশ বলেন, মাঠ যেন দু'হাতে তুলে ছুটতে ছুটতে আকাশের কোলে গিয়ে পাথর হয়ে গিয়েছে। সত্যিই তাই, বহুদূরে কোথাও টিলা দেখলে মনে হয়, একটা শিশু আকাশের দিকে অবাক চোখে তাকিয়ে আছে।

জঙ্গল শুরু হল। মাঝখান দিয়ে রাস্তা। দুপুরবেলাতেও ঝিঁঝিঁর ডাক। দুটো কান ঝমঝম করছে। শাল, সেগুন, মহুয়া, বট, অশ্বত্থ। ফাঁকে ফাঁকে রোদ নেমেছে। গাড়ি কখনও উপরে উঠছে, কখনও নামছে নীচে। ঢালুতে নামার সময় মেজমামা স্টার্ট বন্ধ করে দিচ্ছেন। বৃষ্টির জলে রাস্তার দু'পাশ ক্ষয়ে ক্ষয়ে গিয়েছে। নালা তৈরি হয়েছে। একটু অসাবধান হলেই গাড়ি পাশ ফিরে শুয়ে পড়বে।

মেজমামা জিজ্ঞেস করছেন, 'কী রে দীপা, তোর ভয় করছে?'

'একটুও না। ভীষণ ভালো লাগছে।'

'দেখছিস তো, ভয়ের মধ্যেও একটা ভালো লাগা থাকে। যেমন ধর কালো। কালোর মধ্যে কিন্তু সব রঙ আছে।'

রাস্তা শেষ। মেজমামা গাড়ি রাখলেন। সামনে ঘন জঙ্গল। জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সুঁড়িপথ চলে গিয়েছে। বেশ ঠাণ্ডা। শীতের কনকনে বাতাস। শুরু হল পায়ে হাঁটা। দু'পাশে বড়ো বড়ো পাথর। পথও পাথরের। উঁচু নীচু। জায়গায় জায়গায় মারাত্মক রকমের ঢালু। একটু অসাবধান হলেই গড়িয়ে পড়ে যেতে হবে। এত গাছ! দীপার চোখ যেন ঘোর লেগে যাচ্ছে। পৃথিবী কী ভয়ঙ্কর রকমের উর্বর। জমির এত প্রাণ। মেজমামা হঠাৎ গান ধরলেন,

প্রাণ ভরিয়ে তৃষা হারিয়ে
মোরে আরো আরো দাও প্রাণ।
তব ভুবনে তব ভবনে
মোরে আরো আরো আরো দাও স্থান।

দীপা অবাক হয়ে গেল, মেজমামার এত সুন্দর গলা! 'তুমি গান গাও না কেন?'

'গান!' মেজমামা একটা বড়ো পাথরের ওপর বসে পড়লেন, 'গান!' দু' চোখে জল টলটল।

'তুমি কাঁদছ কেন?'

'তোর মা এই গানটাই এখানে গেয়েছিল এইরকম এক শীতেরবেলায়। তোর মাকে ওরা মেরে ফেলল। তোর মায়ের গান শুনলে তুই পাগল হয়ে যেতিস। মাকে মনে পড়ে?'

'খুব আবছা।'

'আয়নার সামনে দাঁড়ালে তুই তোর মাকে দেখতে পাবি। অবিকল তোর মতো।'

মেজমামা একটুক্ষণ থমকে থেকে বললেন, 'তোর মা তোরই মতো ফিকে হলুদ রঙ পছন্দ করত। তোরই মতো ধীর, শান্ত। তোরই মতো নীচু গলায় কথা বলত। লাজুক লাজুক মুখে তাকিয়ে থাকত। কখনও কিছু চাইত না। একেবারে ঠিক আমার মায়ের মতো স্বভাব। বাড়িতে আছে কী নেই বোঝা যায় না।'

চারপাশে গভীর অরণ্য। ঝিল্লির রব। পাতা ঝরে পড়ার খসখস শব্দ। দীপার মেজমামা টিলার উপর বসে আছেন। পায়ের পাশ দিয়ে লেজ খাড়া করে চলে যাচ্ছে শুকনো গিরগিটি। আশ্চর্য একটাই, কোথাও কোনও পাখি ডাকছে না। মেজমামা মুখ তুলে বললেন, 'দীপা পেছতে থাক। সময়ে পিছিয়ে যা। দশ বছর, বারো বছর, পনেরো বছর। তোর মা বসে আছে এই টিলার উপর। আমি তোর মায়ের পায়ের কাছে। ওইখানটায় বসে আছে দাদা। বাবা আর মা পাশাপাশি। আমার পাশে বউদি। তোর মেজমাইমা তখনও আসেনি জীবনে। কলেজে পড়ছে। দৃশ্যটা দেখার চেষ্টা কর। এই পাথরে তার স্পর্শ লেগে আছে। সেই সময়ে যে-গাছগুলি ছিল চারা আজ তারা বিশাল সাবালক। একজন ছিল, এখন নেই; কিন্তু তার না থাকাটাকে অনেকে ধরে রেখেছে। সে না থেকেও আছে। বুঝতে পারছিস ব্যাপারটা! নেইটাকেও কাঁধে নিয়ে পৃথিবী এগোচ্ছে।'

দীপা অবাক হয়ে মেজমামার মুখের দিকের তাকিয়ে রইল। এত সব বোঝার বয়স তার হয়নি, তবু মনে হল এইসব কথার মধ্যেই আসল কথা আছে। মেজমামা তাকে বাইরের ঘর থেকে ভিতরের ঘরে নিয়ে যেতে চাইছে। সেদিন রাতে স্বামী বিবেকানন্দের বাণী ও রচনা থেকে মদালসার কাহিনি শোনাচ্ছিলেন। মদালসা রানি হয়েছেন। রাজাকে বলেছেন, আমার সংসার করতে আপত্তি নেই কিন্তু একটি শর্ত যে সন্তান মানুষ করবার ব্যাপারে তুমি কোনও বাধা দিতে পারবে না। রাজা বললেন, বেশ তাই হোক। তোমার শর্ত মেনে নিলুম। জন্মের পর থেকে মদালসা শিশুকে দোলনায় দোল দেন আর বলেন, 'ত্বমসি নিরঞ্জন!'—তুমি শুদ্ধ, নিরঞ্জন আত্মা।

এতে কী লাভ?

মহা লাভ, আবাল্য শিশুর সংস্কার গড়ে উঠল যে সে নিরঞ্জন।

নিরঞ্জন মানে?

কলঙ্কহীন, নির্মল, শিব। সংসার তোমাকে কাবু করতে পারবে না। রোগ, শোক, দুঃখ, জরা বাইরে দিয়ে চলে যাবে, যেন ফেরিঅলা হেঁকে যাচ্ছে। এই গল্পটা তোকে কেন শোনাচ্ছি, যাতে তোর মনেও এইরকম একটা সংস্কার তৈরি হয়।

আজ এই নির্জন বলে একটা শিলার উপর বসে মেজমামা এমন কিছু বলছেন যা অনেক দূরের কথা। মানুষের ভিতরটাকে অন্যরকম করে দেয়। ভিতরে একটা চাপাদুঃখ তো আছেই, একটা অভাববোধ। নিজের বাড়ি আর মামার বাড়িতে একটা তফাৎ তো থাকবেই। যদিও তুলির সঙ্গে তার কোনও পার্থক্যই মামারা রাখেনি, তবু নিজের মন থেকে—সে যে পরের বাড়ির মেয়ে, ওই বোধটা একেবারে যায়নি। নিজের বাবার কথা ভেবে কুঁকড়ে যায় না দেখতে আসুক, না আসুক, এক পক্ষে ভালো, কিন্তু একটু ভেবে দেখলে মনে

হয় দীপাকে ফুটপাথে ফেলে দিয়ে তিনি অন্য একটি মেয়ের সঙ্গে মজা করতে চলে গিয়েছেন। এমন বাবার পরিচয় নিয়ে পৃথিবীতে বেঁচে থাকতে ভালো লাগে?

'নাঃ, তোর মনটা খারাপ করে দিলাম, নে চ, আরও কিছু দূর যেতে হবে।'

মেজমামা উঠে পড়ে হাঁটতে লাগলেন। এবার ধরেছেন অন্য গান। সেই অপূর্ব সুরেলা গলা। গাছের পাতায় উতলা বাতাসের মাখামাখি। মেজমামা গাইছেন :

আর কত দূরে আছে সে আনন্দধাম।
আমি শ্রান্ত, আমি অন্ধ, আমি পথ নাহি জানি।।
রবি যায় অস্তাচলে আঁধারে ঢাকে ধরণী
কারো কৃপা অনাথে হে বিশ্বজনজননী।।

এই গান দীপা ব্রাহ্মসমাজে শুনেছে। মেজমামা তার চেয়ে ভালো গাইছেন। কানে আর একটা নতুন শব্দ আসছে, জল পড়ার শব্দ। অজস্র ধারায় কোথাও জল পড়ে চলেছে। ঢালু পথ বেয়ে তারা নামছে। বনের মধ্যেই বড়ো টেবিলের মতো খোলা একটা জায়গা। অল্প অল্প ঘাস, বড়ো ছোটো পাথর, রোদ, আর সামনেই ত্রিধারায় নামছে জলপ্রপাত। বড়ো বড়ো পাথরের উপর দিয়ে নেচে নেচে আসছে জলধারা। হেসে কলকল, গেয়ে খলখল, তালেতালে দিয়ে তালি। বাঁ দিক থেকে পাথরের আড়ালে আড়ালে দামাল এক বালিকার মতো ছুটে আসছে একটি ধারা। প্রখর তেজ। জল ছিটকে ছিটকে উঠছে। মূলধারাটি নামছে সামনে। উপরের একটা চাতাল ধরে হরিনাম সঙ্কীর্তনের দলের মতো খোল-করতাল বাজিয়ে ছুটে এসে কিনারা বেয়ে ঝরে পড়ছে অবিরল ধারায়। আর একটি ধারা নামছে একেবারে অন্যপথে। অনেকটা নীচে তৈরি হয়েছে গভীর একটি হ্রদ। সেই হ্রদ উপচে ডান দিকের শিলাপথ ধরে বয়ে গিয়েছে নদী, তার নাম উশ্রী। এই উশ্রীকে নিয়েই কবি সুনির্মল বসু লিখেছেন,

মনে পড়ে অতীতের স্মৃতি অনাবিল
উশ্রী নদীর জল করে ঝিলমিল
আমলকী বনে বনে ছায়া কাঁপে ক্ষণেক্ষণে
শিরশির করে ওঠে 'শিরশিয়া' ঝিল'!

কবি সুনির্মলের বাড়ি দীপা দেখেছে। সামনে মনোরঞ্জন গুহঠাকুরতার বাড়ি। লম্বা লম্বা সিঁড়ি। পিছনেই পশুপতি বসুর ছোট্ট একতলা। বড়ো বড়ো কাঁঠাল গাছের ছায়ায় আশ্রমের শান্তি। কবির বাস এইখানেই।

মেজমামা একটা চ্যাটাল পাথরে ধ্যানাসনে বসে দীপাকে ডেকে বললেন, 'বোস এখানে, প্রকৃতি দেখ। প্রকৃতির সর্বত্র পরমেশ্বরের আনন্দের প্রকাশ। ঝরনার মতো উপছে পড়েছে। জায়গাটা তোর ভালো লাগছে না?'

'ভীষণ ভালো লাগছে মেজমামা। মনে হচ্ছে এইখানেই থাকি আর কোথাও যাব না।'

'তাহলে একটা গান শোন।'

মেজমামা গাইতে লাগলেন,

'আমি কান পেতে রই ও আমার আপন হৃদয় গহন-দ্বারে বারে বারে
কোন্ গোপনবাসীর কান্নাহাসির গোপন কথা শুনিবারে-বারেবারে।।
ভ্রমর সেথা হয় বিবাগি নিভৃত নীল পদ্ম লাগি রে,
কোন রাতের পাখি গায় একাকী সঙ্গীবিহীন অন্ধকারে বারেবারে।।'

দীপা আর থাকতে পারল না। সেও গলা মেলাল। সামনে কলকল ঝরনা। একসময় মনে হল দীপা প্রকৃতির সঙ্গে এক হয়ে গিয়েছে। আমি আকাশ হয়ে গিয়েছি। নীল নীল বাতাসের অনির্বার ছোটাছুটি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত পবিত্রতার তরঙ্গ খেলছে। দেহের সমস্ত দুয়ার খুলে গিয়েছে। পাখি উড়ে যাচ্ছে ডানা মেলে। দীপার চোখে জল এসে গিয়েছে। এত সুখ শেষপর্যন্ত থাকবে তো! তার কানের কাছে সবাই ঘণ্টার মতো বাজিয়ে গিয়েছে ঘোষণা, মেয়েটা অপয়া। দুর্ভাগা। অনেকে শরীরের লক্ষণ মিলিয়ে তার জাত ঠিক করেছে, পদ্মিনী। শঙ্খিনী নয়, হস্তিনী নয়, পদ্মিনী। এ মেয়ের সংসার হবে না। তখন দীপার হয়ে বলার কেউ ছিল না।

অঝোর ঝরনার মতো মেজমামা অঝোরে গেয়ে চলেছেন। একসময় গান থামিয়ে বললেন, 'চল এইবার সাধুর ডেরায় যাই।'

বাঁদিকে একটা ভয়ঙ্কর বিপজ্জনক সুঁড়ি পথ সোজা উপর দিকে উঠে গিয়েছে। বড়ো বড়ো পাথর। কোনটা আলগা হয়ে ঝুলছে। দু'পাশে ঝোপঝাপ। খুব সাবধানে দু'জনে উঠছে। অনেকটা ওঠার পর চাতালের মতো একটা জায়গা। সেখানে পাথরের উপর পাথর সাজিয়ে একটা কুঠিয়া। খুব নীচু হয়ে ঢুকতে হয় এইরকম একটা দরজা। চারপাশে পাথর ছড়িয়ে একটা বেদি। উশ্রীতি পাথরের অভাব নেই। একেবারে পাশ দিয়ে লাফাতে লাফাতে ফুটতে ফুটতে নীচের দিকে গড়িয়ে নামছে ঝরনার একটা শাখা। বাঁপাশে বিশাল একটা তেঁতুল গাছ। তার তলাতেও বেদি।

মেজমামা নীচু হয়ে কুঠিয়ায় ঢুকলেন। পিছনে দীপা। ভিতরটা অন্ধকার অন্ধকার। কম্বল বেছানো। তার উপর বসে আছেন শীর্ণকায় এক সাধু। পরিধানে গেরুয়া। সামনে একটা স্লেট পেনসিল। মেজমামাকে দেখে সাধু স্লেটে লিখলেন, ওয়েলকাম।

মেজমামা পাথরের উপর বসলেন, পাশে দীপা। মেজমামা বললেন, 'থ্যাঙ্ক ইউ।' দীপাকে দেখিয়ে বললেন, 'আমার ভাগনী।'

সাধু হাসলেন। দীপার মনে হল, হাসিটার জাত আলাদা। ছেলেমানুষের অকারণ আনন্দের হাসির মতো। শরীর শীর্ণ হলেও প্রদীপ্ত মুখ, উজ্জ্বল চোখ।

তাকিয়ে আছেন অথচ দেখছেন না কিছুই। এইরকম একটা ভাব। সুদূর দৃষ্টি। কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকলে অস্বস্তি হয়।

মেজমামা বললেন, 'একটা দুটো কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?'

সাধু ঘাড় দুলিয়ে বোঝাতে চাইলেন, 'পারো'।

মেজমামা প্রশ্ন করছেন মুখে সাধু উত্তর দিচ্ছেন স্লেটে লিখে ইংরেজিতে। দীপা পাশে বসে শুনছে আর দেখছে।

মেজমামা প্রথমে জানতে চাইলেন, 'মানুষ কী চায়?'

উত্তর এল, 'মানুষ প্রথমে চায় বাঁচতে। তারপর সে ভালো যা কিছু পায়, অর্থাৎ সে নিজে যা কিছু তার পক্ষে ভালো মনে করে, সেইটাই আরও বেশি করে চাইতে শেখে। যেমন টাকা পেলে আরও আরও টাকা পেতে চায়। বিষয় সম্পত্তি পেলে আরও পেতে চায়। যশ খ্যাতি পেলে আরও পেতে চায়। আগে সে পায়, তারপর সেই পাওয়ার ফল দেখে সে চাইতে শেখে। সবার আগে সে চায় বাঁচতে। আগে জীবন দিয়ে সে ব্যাঙ্কের অ্যাকাউন্ট খোলে। সেইটাই তার মিনিমাম ব্যালেন্স। সেইটাকে বজায় রেখে তারপর যত কিছু সঞ্চয়ের ভাবনা।'

'মানুষ দুঃখও কী চায়?'

'ওটা চাইতে হয় না, আপনিই আসে। টাকার কী একটা পিঠ? দুটো পিঠ নিয়েই টাকা। টাকা চাইলে এপিঠ ওপিঠ দুপিঠই তোমার কাছে আসবে। সুখের উল্টো পিঠেই আছে দুঃখ। এটাকে চাইলেই ওটা এসে যাবে। যেমন ফুল চাইলে ফুলের গন্ধ আসবে। ভ্রমর চাইলে তার গুঞ্জন আসবে। শিশু চাইলে তার ক্রন্দন আসবে। পাখি চাইলে গান আসবে। সাপ চাইলে তার ছোবল আসবে। টাকার সঙ্গে ট্যাক্স আসবে। ছাতার সঙ্গে ছায়া আসবে। রোদের সঙ্গে গরম আসবে। বন্ধুর সঙ্গে শত্রু আসবে। বরফের সঙ্গে শীতলতা আসবে। বাতাসের সঙ্গে ধুলো আসবে। আগুনের সঙ্গে দাহিকা শক্তি। জলের সঙ্গে আর্দ্রতা। কৃষ্ণের সঙ্গে রাধা। পুরুষের সঙ্গে প্রকৃতি। যুগলে আছেন। দুঃখ, যন্ত্রণা মানুষ চায় না। কিন্তু সহ্য করতে শেখে। এই সহ্যের শক্তিটা মানুষের মধ্যেই আছে। ভোগে মানুষ খরচ করে, সহ্যে মানুষ অর্জন করে। দুটো দরজা। ভোগের দরজা দিয়ে শক্তি বেরিয়ে যায় আর সহ্যের দরজা দিয়ে শক্তি ঢোকে।'

'আমার কাছে এটা খুব পরিষ্কার হল, এখন আমাকে বলুন, এরই মাঝে পরমানন্দে কীভাবে বাঁচা যায়।'

'গ্রহণ করতে শিখুন। দুঃখ এবং সুখ, শান্তি এবং অশান্তি, অসুখ এবং আরোগ্য দুটোকেই সমানভাবে নিতে শিখুন। জয় এবং পরাজয় দুটোতেই অবিচলিত থাকুন। জীবন যখন যা কুড়িয়ে পাচ্ছে তখন সেইটাকেই পরম প্রাপ্তি বলে মেনে নিতে শিখুন। তাহলেই আনন্দ। গেল গেল, হল না, হল না, ওর হল আমার হল না, এই ভাবটাই নিরানন্দের কারণ। বৃষ্টিতে ভিজতে হবে,

রোদে পুড়তে হবে, শীতে কুঁকড়ে থাকতে হবে, এইটাই সত্য। এইটা দর্শন করার নামই সত্য দর্শন। এইটাকে অতিক্রম করার সাধনাই হল যোগ। আর এই যোগ অভ্যাস করাই হল সাধনা। কোনও কিছু আশা না করাটাই হল শ্রেষ্ঠ করা। যা পাওয়া যায় সেইটা পাওয়াই হল শ্রেষ্ঠ পাওয়া।'

মেজমামা জিজ্ঞেস করলেন, 'আমরা এত ভয় পাই কেন?'

সাধু লিখলেন, 'ভয় পেতে শেখানো হয়েছে বলেই ভয় পাই। সমস্ত ভয়ের পিছনেই আছে মৃত্যু চিন্তা। মৃত্যুকে বন্ধু করতে পারলেই ভয়কে জয় করা যায়। মানুষের উপর বিশ্বাস হারানোটাই আতঙ্কের।'

'আমি কোন পথে চলব?'

'পথ বলে কিছু নেই। সবটাই প্রান্তর। চলার চেয়ে স্থির থাকার চেষ্টাই ভালো। পাথর যত গজায় ততই তার ক্ষয় হয়। শ্যাওলা ধরে না। জ্ঞানের শ্যাওলা ধরাতে হলে স্থির থাকতে হবে। পথ পড়ে থাকে মানুষই চলে চলে ক্লান্ত হয়। বিচারের পথই শ্রেষ্ঠ পথ। নিজেকে জানাই শ্রেষ্ঠ জ্ঞান। যে সাধু হবে সে সাধুই হবে। যে ভোগী হবে সে ভোগীই হবে। যে চোর হবে সে চোরই হবে। যার যা পথ সে সেই পথেই যাবে। এ নিয়ে অকারণ ভাবার কোনও প্রয়োজন নেই।'

'তাহলে মানুষের চেষ্টা বলে কিছুই থাকবে না?'

'অবশ্যই থাকবে। আমি যা নই সেইটা ভাবার চেষ্টা করাই চেষ্টা। নিজের স্বরূপটাকে ধরার চেষ্টাই চেষ্টা। ধরতে পারলেই শান্তি।'

'তাহলে মানুষ ভালো হবে কী করে?'

'যে ভালো হবে সে ভালো হবে, যে খারাপ সে খারাপই হবে। গেরুয়ার তলায় ভোগী লম্পট থাকতে পারে। স্বভাব পোশাকে নেই মনে আছে। ভদ্রলোকের পোশাকে ইতরও ঘুরতে পারে।'

'আপনি আমাকে বদলে দিন।'

'বদলানো যায় না। যে বদলাবার সে নিজেই বদলে যায়। কুঁড়ি নিজে থেকেই ফুল হয়। শুঁয়োপোকা নিজে থেকেই প্রজাপতি হয়। মানুষ যদি রূপান্তর চায় তাকে প্রার্থনা করতে হবে। গুরুর কিছু করার ক্ষমতা নেই। কৃপা ছাড়া কিছু হয় না।'

মেজমামা সব শেষে বললেন, 'এই মেয়েটিকে একটু আর্শীবাদ করবেন।'

সাধু ইশারায় দীপাকে কাছে ডাকলেন। দীপা ভয়ে ভয়ে কাছে এগিয়ে গেল। এমন সাধু সে কখনও দেখেনি। কোনও মন রাখা কথা নেই। সব প্রশ্নেরই কাটা কাটা উত্তর। সাধুর শরীর থেকে সুন্দর সাত্ত্বিক একটা সুবাস বেরোচ্ছে। দীপার মাথায় হাত রাখতেই একটা শক্তির তরঙ্গ খেলে গেল শরীরে। দীপা কেমন যেন হয়ে গেল। মনটা সেই মুহূর্তে হয়ে গেল ভোরের আকাশের মতো। সাদা একটা

পাখি চক্কর মারছে ডানা মেলে। কেমন যেন শীত শীত করছে। দুঃখও নয় সুখও নয় ভারমুক্ত একটা অনুভূতি।

সব শেষে সাধু লিখলেন, 'এই মুহূর্তে তোমার যদি কোনও অনুভূতি হয়ে থাকে আর তা যদি তোমার ভালো লেগে থাকে, সেই অনুভূতিকে তুমি দীর্ঘস্থায়ী করার চেষ্টা করতে পার। এর জন্য প্রয়োজন পবিত্র জীবন।'

দীপাকে খুব সহজ উপমায় সাধু বুঝিয়ে দিলেন, দেহের আকাশ হল মন। চিন্তা হল মেঘ। একেবারে মেঘশূন্য নির্মল মনাকাশ সাধারণ মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। দেখতে হবে মেঘের রঙ যেন সাদা থাকে। ধারণাই হল সূর্য। সেই ধারণার দীপ্তিতেই মেঘ সাদা হয় সোনালি হয়। শুভ্র চিন্তাকে ধারণা করো। ইন্দ্রিয়ের জানালা দিয়ে জগতকে দেখো না। উপরের জানালা, স্কাইলাইট দিয়ে দেখ। উঁচুতে উঠতে পারলে মানুষ অনেকটা দূর দেখতে পায়। দি সেম আই সে টু মাই ডক্টর।

মেজমামা কুঠিয়া ছেড়ে বেরিয়ে আসার আগে সাধুর সামনে মাথাটা নিচু করে দিয়ে বললেন, 'টাচ মি।'

সাধু স্লেটে লিখলেন, 'আজ উল্টোটা হোক। আপনি আমাকে স্পর্শ করুন। দেখি কি ভাইব্রেশন আসে।'

মেজমামা স্পর্শ করলেন। হাত রাখলেন সাধুর ব্রহ্মতালুতে। হাত যেন ম্যাগনেট আটকে রইল বহুক্ষণ। সাধু বসে আছেন চোখ মুদে, স্থির। বেশ কিছুক্ষণ থাকার পর মেজমামার হাত খুলে গেল। দু'জনে দু'জনের দিকে তাকিয়ে রইলেন। সাধু হাসলেন। মেজমামা হাসলেন।

সূর্য অস্ত নেমেছে। অক্লান্ত, অফুরন্ত উশ্রী লাফিয়ে লাফিয়ে চলেছে। ডুরে শারি পরা চপলা বালিকার মতো। আকাশের রঙে দিবাবসানের রহস্য জমছে। দূরের গাছ শাখা-প্রশাখার খুঁটিনাটি হারিয়ে শুধুমাত্র একটি আকারে পরিণত হচ্ছে। বিশাল বিশাল শিলাখণ্ড যেন আরও ভারি হয়ে উঠছে। নিস্তব্ধতা ভেঙে ফেলার ভয়ে পাখিরা আর শব্দ করছে না। ইঞ্জিন বন্ধ গাড়ি নিঃশব্দে গড়িয়ে চলেছে ঢালুপথ বেয়ে। মেজমামা স্টিয়ারিং-এ স্থির। পাশে বসে আছে দীপা।

গাড়ি খাড়াইতে উঠবে। ইঞ্জিনে ইগনিসনের শব্দ। যন্ত্রের শক্তি গর্জন করে উঠল।

দীপা বলল, 'মেজমামা, এসো না, আজ রাতটা আমরা এইখানেই থেকে যাই।'

'আমারও তো ওইরকম ইচ্ছে করে, ওই তেঁতুলতলায় সাধুর কুঠিয়ার কাছে সারারাত বসে থাকব ধুনি জ্বালিয়ে। মাথার উপর পিচ কালো আকাশ। তারায় ভরা। অন্ধকারে ঝরনার কলকল শব্দ। কোনও বন্যপ্রাণী এসে জল খাচ্ছে। চকচক আওয়াজ। বনের ভিতর আগুনের গোলার মতো দুটো চোখ।

অন্ধকারের পাঁচিল ঘেরা নিভৃত একখণ্ড বন। কত কী হয়তো দেখা যায় ওই সময়টায়। কত অলৌকিক কাণ্ডকারখানা। ভাবি কিন্তু সাহসে কুলোয় না। চড়া আলো, পাকা বাড়ি আর সংসারের আদরে থাকতে থাকতে ভীতু হয়ে গেছি রে দীপা। থাকতে বাধ্য না হলে থাকতে পারব না।'

'সাধু কী করে আছেন। আমরা তো চলে এলুম উনি তো একা।'

'সেই কারণেই উনি সাধু।'

গাড়ি ছুটছে শহরের দিকে জোর গতিতে। গাছগুলো সব ঘুরতে ঘুরতে ছিটকে পিছনে চলে যাচ্ছে। গভীর রাতে দীপা একা বিছানায় শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগল। সাধু এ কী বললেন। যে যা হবে সে তা হয়েই এসেছি। লেখাপড়া শিখে সবাই পণ্ডিত হতে পারে, কিন্তু সে চোর হবে না সাধু হবে, দয়ালু হবে না নিষ্ঠুর হবে, সেটা ঠিক হয়ে আছে। সে কী হবে, কেমন হবে সেটা তার কপালে আগেই কেউ লিখে দিয়েছে। চেষ্টা করলে পণ্ডিত হওয়া যায় সাধু হওয়া যায় না। সেটা অন্য ব্যাপার। দীপার কেমন যেন ভয় করতে লাগল। নিজের বাড়ির কথা মনে পড়ে গেল। সবার আগে মনে পড়ে গেল বাবাকে। একদিন টেলিফোনে কথা বলছেন সেই মহিলার সঙ্গে। খেয়াল নেই যে ঘরের আর এক ধারে দীপা টেবিলে বসে লেখাপড়া করছে। সে কী নরম নরম, মিষ্টি মিষ্টি কথা। মানুষটার মুখের চেহারা অন্যরকম হয়ে গিয়েছে। চোখ দুটো আধবোজা। ঢোলা হাতা পাঞ্জাবি, ফাঁদালো পাজামা পরনে। কবজিতে সোনার ব্যান্ড লাগানো নীল ডায়ালের দামি ঘড়ি। আঙুলে হীরের আংটি ঝিলিক মারছে। এমন এমন সব কথা বলছেন যা কোনও মেয়ের শোনা উচিত নয়। নরম কোলে শুয়ে বেড়াল যেমন ঘড়ঘড় করে গলাটা অনেকটা সেইরকম। টেলিফোনেই আদর করছেন। দুপুরেই একবার দেখা করার অনুমতি চাইছেন। পায়ে ধরছেন। বলছেন, তোমার লাথির দাম লাখ টাকা। বলছেন, তোমার গাড়ি বুক করে দেওয়া হয়েছে। কালই হয়তো ডেলিভারি দেবে। তা হলে আজকের দিনটা তুমি আমার সঙ্গেই থাকবে। তুমি আর আমি।

দীপা আড়ষ্ট হয়ে বসেছিল টেবিলে। নিজেকেই অপরাধী মনে হচ্ছিল। এইসব ভয়ঙ্কর কথা তার শোনা উচিত হয়নি। একটা মানুষ যে কী না তার বাবা, একটা বাজারি মহিলার শরীরের জন্যে পাগল হয়ে গিয়েছে। দশ হাত দূরে মেয়ে বসে আছে, কোনও দৃকপাত নেই। দুপুরে দেখা হলে কী কী করবে তার খোলাখুলি বর্ণনা। সেই সব শুনে দীপার শরীর হিম হয়ে গিয়েছিল। একটা মেয়েকে একজন পুরুষ এইভাবে ব্যবহার করবে। সে সহ্য করবে। তার বদলে সে একটা গাড়ি পাবে, হিরে পাবে, অনেক টাকা পাবে।

দীপা চিৎ হয়ে শুয়ে আছে বিছানায়। খাটটা এত বড় যে তিনজন পাশাপাশি শুলে আরও একজনের জায়গা থাকবে। একেবারে একা সে। ঘরের তিন পাশের জানলা খোলা। তিন দিকেই গাছপালা। মহুয়া, দেবদারু, আমলকী,

কাঞ্চন। পাতায় পাতায় বাতাসের কানাকানি। নিশ্চিদ্র অন্ধকার। দীপা নিজের শরীরে হাত রাখল। এই শরীর! বুক, পেট, বাহু, কণ্ঠদেশ, ঠোঁট। এই শরীর পুরুষরা ছিঁড়ে খেতে চাইবে। বন্ধুত্ব করবে। বলবে প্রেম। চিঠি লিখবে। বেড়াতে নিয়ে যাবে, রেস্তোরাঁয় খাওয়াবে, উপহার দেবে। লক্ষ্য কিন্তু একটাই। বর্বরতা। হাত দিয়ে নিজের শরীরের বিভিন্ন স্থান স্পর্শ করতে করতে দীপার মনে হল কোথাও একটা ভালো লাগার ব্যাপার আছে। একটা অনুভূতি সারা শরীরে চারিয়ে যাচ্ছে। একটা কাঁপুনি আসছে। একটা কিছু জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করছে। ভীষণ একটা আবেগ, দুঃখ, নিঃসঙ্গতা, যন্ত্রণা, আনন্দ।

দীপা বিছানায় উঠে বসল। একটু আগে শীত শীত করছিল, এখন গরম। আবার মনে পড়ল সাধুর কথা! মানুষ যা হতে এসেছে, তাই হবে; যেমন সাপ সাপ হবে, বাঘ বাঘ। তা হলে! তাই কী বারে বারে সেই নার্সকে মনে পড়ে। মনে হয় সে কাছে থাকলে খুব ভালো হত। সে ছিল নেশার মতো। দীপার ভিতরটা হুহু করে উঠল। শরীর আগুনের মতো গরম। মনে হচ্ছে, সব পোশাক খুলে ফেলে। আবার সেই কাঁপুনি। পা থেকে মাথা পর্যন্ত। দাঁতে দাঁতে শব্দ হচ্ছে। অসহায়ের মতো বাইরে তাকাল। মেজমামার জানলা দিয়ে আলোর একটা আভা বাইরের বাগানে গাছের পাতায় মিহি সিল্কের মতো জড়িয়ে আছে। জেগে আছে এখনও।

দীপা খাট থেকে নামল। অন্ধকারেই আন্দাজ করে এগিয়ে গেল দরজার দিকে। ছিটকিনি খুলে বাইরে এল। বিশাল লবি। অন্ধকারে সোফা টোফা জমাট বেঁধে আছে। ঘড়ির টিকটিক। মার্বেল পাথরের ভেনাস। সাইড টেবল, কর্নার টেবল, সেন্টার টেবল। জায়গাটা হা হা করছে। অশরীরী কেউ ছিল যেন। এখনও হয়তো আছে। দীপাকে লক্ষ করছে।

দীপার সঙ্কোচ হচ্ছিল, তবু সে মেজমামার দরজায় টোকা মারল। মেজমামা কে, বলে দরজা খুলে দীপাকে দেখে অবাক হলেন, 'কী রে! তুই! ঘুমোসনি এখনও! ভয় পেয়েছিস?'

দীপা ফিসফিস করে বললে, 'একবার আসবে আমার ঘরে?'

'কী হয়েছে বল তো, সাপখোপ কিছু বেরিয়েছে?'

'ওসব কিছু নয়, তুমি এসো।'

দীপার পিছনে মেজমামা। দীপা আলো জ্বেলে দরজা ভেজিয়ে দিল। মেজমামার সামনে দাঁড়িয়ে বলল, 'দ্যাখো তো গাটা জ্বর এসেছে কি না।'

মেজমামা কপালে হাত রাখলেন। গলার কাছে রাখলেন। নাড়ি টিপলেন, 'মনে হচ্ছে জ্বর এসেছে। দাঁড়া থার্মোমিটার আনি। তোর মেজমাইমাকে একবার ডাকি।'

'না, থার্মোমিটার, মেজমাইমা, কোনও কিছুর দরকার নেই।'

'তা হলে একটা ওষুধ দিচ্ছি, খা।'

'সে পরে হবে। তুমি আমার বন্ধুর মতো, তোমাকে আমি একটা কথা বলতে চাই। তুমি আগে বসো।'

মেজমামা মশারি সরিয়ে খাটের ধারে বসলেন। দীপাও বসল। মেজমামা ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞেস করলেন,

'কী হয়েছে বল তো?'

'আমার ভয় করছে।'

'তুই আমাদের বিছানায় শুবি চল। তিনজনে খুব আরামে শোয়া যাবে।'

'সে ভয় নয়, অন্য ভয়।' দীপা ইতস্তত করছে বলতে; বলতে তাকে হবেই। একজন কারোকে বলা দরকার। মেজমামাই তার একমাত্র বন্ধু যাকে সব কথা বলা যায়। সাধুর কথায় দীপা ভীষণ ভয় পেয়ে গিয়েছে। রাত যখন গভীর হয়, দরজা বন্ধ করে সে যখন বিছানায় মশারির তলায়, তখন সে কেন সকালের দীপা থাকে না। বয়সটা অনেক বেড়ে যায়। শরীরে টান ধরে। বুক, পেট, পিঠ সব ভারি হতে থাকে। কণ্ঠস্বর কেমন পাল্টে যায়। চরিত্রটা বদলে যেতে চায়। সে কী তার বাবার মতো, ঠাকুরদার মতো হয়ে যাবে। জ্যাঠামশাই, কাকা আর কাকিমাদের মতো!

মেজমামা বললেন, 'বল, কী বলবি বল! শীতের রাত হিহি করছে?'

'তোমাকে এমন একটা কথা বলব, যা একমাত্র তোমাকেই আমি বলতে পারি। তুমি আমার বন্ধু। সেই কথা তুমি আর কারোকে বলবে না।'

মেজমামা ভয় পেলেন, 'কেউ কিছু বলেছে তোকে। হতচ্ছেদ্দা করেছে। অভিমান হয়েছে?'

'না, সে সব কিছু নয়। এমন কথা যা বলা যায় না, তবু বলছি। তুমি আমাকে ভালো করে দাও।'

'সামান্য একটু জ্বর হয়েছে ঠান্ডা লেগে, তার জন্য এতটা উতলা হচ্ছিস কেন?'

'তুমি তোমার ঘরের আলো নিবিয়ে, দরজাটা ভেজিয়ে দিয়ে এস। মেজমাইমা ঘুমোচ্ছে তো?'

'হ্যাঁ, তোর মামি ঘুমকাতুরে। শুয়েই ঘুমিয়ে পড়ে।'

'তা হলে যাও, যা বলছি তাই করে এস।'

মেজমামার হঠাৎ একটা অস্বস্তিকর অনুভূতি এল মনে। কত রকমের চোখ আছে পৃথিবীতে। মাঝে মাঝে ভাবতে ইচ্ছে করে। ঈশ্বরের চোখ, নিজের চোখ, সমাজের চোখ। নিজের চোখে আমি নিষ্পাপ। সমাজের চোখে আমি যে কোনও মুহূর্তে পাপী হয়ে যেতে পারি। কেউ কখনো এইভাবে অমন করেছিল অতএব তুমিও তাই করবে। সেইটাই আমাদের সিদ্ধান্ত। তুমি নিজেকে সাধু বললে কী হবে! পাপেরও একটা শাস্ত্র আছে। যেমন ঘণ্টা বাজলেই মনে করতে হবে পুজো হচ্ছে, সেইরকম সম্পর্ক যাই হোক, বয়েসের ব্যবধান যতই থাক, একটা ঘরে অনেক রাতে একজন পুরুষ ও রমণী, হোক না কিশোরী, পাপ

শাস্ত্র বলবে, ভয়ঙ্কর একটা কিছু ন্যাক্কারজনকম ঘটনা ঘটছে। নিজের মন দিয়ে মানুষ বাইরের পৃথিবীটাকে দেখে। সাধুর লেখা সেই গল্প মনে পড়ে গেল—

ফাঁকা একটা মাঠ। অমাবস্যার অন্ধকার রাত। মাঝখানে একটা ঢিবি। অন্ধকারে দেখলে মনে হবে, একটা লোক গুড়ি মেরে বসে আছে। সুঁড়িখানা বন্ধ হয়েছে। মাঝরাতে মাতাল ওই মাঠের পথ ধরে টলতে টলতে ফিরছে। ঢিবিটা দূর থেকে নজরে পড়েছে। নিজের মনেই বলছে, বাঃ, আমার নেশা হওয়ার আগেই, তুমি ভাই লাগিয়ে বসে আছ। তোমার মালের তো বহুত জোর। সে তো আফসোস করতে করতে চলে গেল। একটু পরেই এলেন এক সাধু। দূর থেকে ঢিবিটাকে দেখছেন। ভাবছেন, কী ভাগ্যবান, আমি এখনো বসতেই পারলুম না, আর আপনার ধ্যান লেগে গিয়েছে! সব শেষে এক পুলিশ, দেখে ভাবছেন, ব্যাটা চোর, মাল সাফ করে এখানে ঘাপটি মেরে বসে থাকা হয়েছে! একটা ঢিবি, তিনজন মানুষের তিন ধরনের দেখা।

মেজমামা বললেন, 'দরজাটা খোলা থাক, আলোটাও জ্বলুক। আমাকে দেখতে না পেলে তোর মাইমা অন্যরকম ভাববে।"

দীপা বললে, "অন্যরকম মানে কী রকম! আমি তো তোমাকে একেবারে অন্যরকম কথাই বলতে চাইছি।"

দীপা বুঝতে পারছে, মেজমামা ভীষণ ভয় পেয়েছে। ঠিকমতো বসতে পারছে না। পালাবার জন্যে উসখুস করছে। ঘন ঘন ঢোঁক গিলছে।

শেষে বললেন, "কী এমন কথা! আজ অনেক রাত হয়েছে, কাল সকালেও তো বলা যায়।"

"এসব কথা রাত ছাড়া বলা যায় না। তুমি অমন ছটফট করলে বলতে পারব না। সময় লাগবে। সারাটা রাতই লেগে যেতে পারে। তুমি অমন ভয় পাচ্ছ কেন? ভূত দেখেছ না কী!"

"না, তা নয়, তবে তোকে কেমন অস্বাভাবিক লাগছে। চুল এলোমেলো, চোখ ছলছল। জ্বরের ঘোরে ভুল বকছিস না তো।"

"এখনো বকিনি, তবে এইবার যা বলব তাতে তোমার মনে হবে আমি সত্যিই হয়তো ভুল বকছি।"

দীপা মেজমামার পাশে বসে পড়ল। দু'হাত দিয়ে মেজমামার সহজ সরল মুখটা নিজের দিকে ঘুরিয়ে বললে, "আমার মুখটা ভালো করে দেখে বল তো, কার মতো, বাবার মতো, না মায়ের মতো।"

কিছুক্ষণ দেখে বললেন, "দু'জনের কারও মতোই নয়, একেবারে অন্যরকম।"

"মেয়েদের চরিত্র কার মতো হয়, বাবার মতো, না মায়ের মতো। তুমি আমার বাবাকে চেন, আমি কী সেইরকম হব। চরিত্রহীন।"

"এই বয়সে এই প্রশ্ন কেন?"

"সাধু আমার মনে ভীষণ ভয় ধরিয়ে দিয়েছেন। যে যা হবার তাই হবে। অন্য কিছু হওয়ার চেষ্টা করলেও হতে পারবে না। আমি কী হবো। আমার মায়ের মতো, আমার বাবার মতো না একেবারে অন্যরকম।"

"তুই একেবারে পাগলের মতো কথা বলছিস। এই বয়সে এইসব কেউ ভাবে না। তোকে আমরা সবচেয়ে ভালো কলেজে লেখাপড়া শেখাব। পারলে বিলেত পাঠাব। গবেষণা করবি, ডিগ্রি নিবি। তারপর নিজের জীবনের ধারা নিজে ঠিক করে নিবি।"

"সে তো শিক্ষার কথা, চরিত্রের কথাটা বল।"

"শিক্ষাই তো চরিত্র। আলাদা করে চরিত্রের কথা ভাবছিস কেন?"

"আজকের কাগজে একটা খবর পড়েছ, এক শিক্ষিত অধ্যাপক আর একটা মেয়েকে বিয়ে করবে বলে বউকে খুন করেছিল ধরা পড়েছে। যে মেয়েটাকে বিয়ে করবে সে ওই অধ্যাপকের ছাত্রী। লোকটা তো শিক্ষিত, নামকরা অধ্যাপক।"

"ওরা অপরাধী। তুই খুঁজে খুঁজে ওইসব খবর পড়ে মাথা খারাপ করবি কেন। এমন ঘটনা অনেক ঘটে। মানুষ নিজের দুর্বলতার হঠাৎ অনেক কাজ করে ফেলে পরে আপসোস করে। রাগের মাথায় মারতে গিয়ে মেরে ফেলে জেলে যায়। একে বলে, টেম্পরারি ইনস্যানিটি। সব দেশেই এমন ঘটনা ঘটে। তাতে তোরই বা কী, আমারই বা কী! সাপ গর্তে থাক, বাঘ জঙ্গলে, কুমির জলে, পাখি গাছে, আমরা আমাদের মতো, ওরা ওদের মতো। কেউ কারও এলাকায় ঢুকবে না। তাহলেই হল।"

"তুমি কি জান, আমি একটা খারাপ মেয়ে। আমাকে খারাপ করে দিয়েছে।"

দীপার মেজমামা একটু থমকে গেলেন। কুমারী মেয়েদের এই একটা বয়স। কৈশোর আর যৌবনের সন্ধিক্ষণ। যে বাড়িতে মানুষ হচ্ছিল, সেই বাড়ির মানুষগুলোর পয়সা ছিল, আদর্শ ছিল না। সব কটার ঠোঁটের উপর অহঙ্কারের গোঁফ। পুলিশ, সরকারি পদস্থ কর্মচারীদের তোয়াজ করে যতরকম অন্যায় পথ আছে, সেই পথে অর্থ উপার্জন। প্রতিটি মানুষ ইন্দ্রিয়পরায়ণ। মাত্রাতিরিক্তি যৌনতা। দীপাকে কে কীভাবে ব্যবহার করেছে কে জানে! সে সব কথা এই মাঝরাতে শুনে লাভ কী! মানুষ তো প্রতি মুহূর্তে নতুন জীবন শুরু করতে পারে। যদি ইচ্ছে থাকে, যদি মনের জোর থাকে।

মেজমামা বললেন, "দীপা, তুই কী বলতে চাইছিস আমি জানি না, আমি শুনতেও চাই না। আমি যেমন তোর মামা, আবার আমি তোর অন্তরঙ্গ বন্ধু। আমি বিশ্বাস করি, তুই ভীষণ ভালো মেয়ে। তোর পক্ষে খারাপ হওয়া সম্ভব নয়, কারণ তোর রক্তে আমাদের বংশের রক্ত আছে।"

দীপা একটুক্ষণ ভাবল। তার মনে হল, যে কথাটা সে বলতে চাইছে, সেটা বলা যায় না। যেমন সকলের সামনে উলঙ্গ হওয়া যায় না। দীপা ভয়

পেয়েছিল। সেই ভয়টা ক্রমশ কেটে আসছে। একটা ঘরে একা একটা মানুষ, একটা শরীরে একটা মন, ভয় পেতেই পারে। দীপা ভাবলে, আর কিছুদিন দেখাই যাক না। কি হয়! যদি কিছু না-ই হয়, তাহলে যা হবার তাই হবে। অনেকেরই তো অনেক খুঁত থাকে, কারো ছ'টা আঙুল, কারো থ্যাবড়া নাক, গজদন্ত।

দীপা বলল, "চলো, আমরা শুয়ে পড়ি। যে কথাটা তোমাকে বলতে চাই, তা বলা যায় না। ওটা আমার ভিতরেই থাক।"

"দীপা তোর যা বয়েস সেই বয়সে তুই কেমন কের এইসব কথা বলিস! একেবারে পাকা বুড়ির মতো!'

"মেজমামা, মেয়েরা তাড়াতাড়ি পেকে যায়।"

একলা শুতে ভয় করলে, তুই তোর মাইমার পাশে গিয়ে শো, আমি তোর ঘরে শুচ্ছি।"

"আমার ভূতের ভয় নেই। আমার মা মারা গিয়ে আমাকে অনেকটা সাহসী করে দিয়ে গিয়েছে।"

"আমি তোকে আরও সাহসী করে দিয়ে যাব। তোকে আমি আত্মরক্ষার কায়দা শেখাব। অ্যানাটমি চেনাব। মানুষের শরীরে কয়েকটা স্পট আছে, সেখানে মরতে পারলে যত বড়ো পালোয়ানই হোক কাবু হয়ে যাবে।"

"তুমি আমাকে মারধোর শেখাবে কেন?"

"একটাই কারণ, এদেশের পুরুষরা মেয়েদের ভোগের সামগ্রী ছাড়া আর কিছু ভাবতে শেখেনি। বাইরে ভদ্রলোক ভিতরে জানোয়ার। অথচ আমাদের দেশে দেবতার চেয়ে দেবীর সংখ্যাই বেশি।"

"তুমি আমাকে যুযুৎসু শেখাবে?"

"আমি শেখাব না, আমার এক জাপানি বন্ধু শেখাবে।"

মেজমামা তাঁর ঘরে চলে গেলেন। দীপা শুয়ে পড়ল।

মেজমামার ঘুম কম। দীপার চিন্তায় সারারাত প্রায় জেগেই রইলেন। মনে একটা খোঁচা। কী এমন হতে পারে মেয়েটার। অনেক কিছুই হতে পারে। ওর মনটাকে কেউ নষ্ট করে দিয়েছে। মানুষকে মনেও বিকলাঙ্গ করা যায়!

পৃথিবীতে মানুষই মানুষের সবচেয়ে বড়ো শত্রু। বাঘ, ভাল্লুক, সাপ নয়। বড়দার লেখা একটা কবিতা মনে পড়ছে,

মনে হয়েছিল মানুষ
দুটো হাত, দুটো পা
কথা বলে মানুষেরই মতো,
ভুল ভেঙে যেতে দেরি হল না
দেখতে মানুষ হলেও
নির্ভেজাল জানোয়ার।।

কে ?

এক

দু'গেলাস চা, দুটো দিশি বিস্কুট। হাসপাতালের সামনে কোনোরকমের একটা চায়ের দোকান। যত বিপদগ্রস্ত মানুষই খদ্দের। কী খাচ্ছে না খাচ্ছে খেয়ালই নেই। মন পড়ে আছে বিপরীত দিকের হাসপাতালে, যেখানে প্রিয়জনেরা জীবন-মৃত্যুর সঙ্গে লড়াই করছেন। সায়েব আমলের এক নম্বর হাসপাতালের এখন দশ দশা। ভেতরে ঢুকলে কান্না পায়।

সকাল থেকে পেটে কিছু পড়েনি। কোনো রকমে চা শেষ করে আমি আর সুবীর একটা পার্কে গিয়ে বসলুম। শুয়ে পড়তে ইচ্ছে করছে। সুবীর বললে, 'কি হয়ে গেল বল তো! আমি ভাবতেই পারছি না। কি করে হল? আত্মহত্যার চেষ্টা নয় তো!'

'আত্মহত্যা করতে যাবে কি কারণে? অসাবধানতা। গ্যাস জ্বালিয়ে দেশলাই কাঠিটা নাইটির ওপর ফেলেছে। খেয়াল করতে পারেনি। যখন দাউ দাউ করে জ্বলে উঠেছে, তখন ভয়ে কি করবে না করবে ঠিক করতে পারেনি। অনেকেই পারে না।'

'বেশ ভালো রকম পুড়েছে। তোর কি মনে হয়, বাঁচবে তো?'

'ভগবান জানেন। বার্ন কেসে কিচ্ছু বলা যায় না।'

সুবীর বাদাম কিনলে। সন্ধে এগিয়ে আসছে। একপাশে বাচ্চারা হইচই করছে। ছড়ি হাতে বৃদ্ধরা পাকের পর পাক মেরে চলেছেন। আরও আরও বাঁচতে হবে। কেউ মরতে চায় না। সাজপোশাক দেখে বোঝা যায়, বিত্তবান। হয় বড়ো চাকরি করতেন, না হয় ব্যবসা। বাড়ি আছে, গাড়ি আছে, ভরপুর সংসার।

এই সরকারি উদ্যানে আগেও বসেছি অনেকবার। ছাত্র জীবনে কত বিকেল এখানে পড়ে আছে! সৌরভ, শ্যামল, বিদ্যুৎ বিকাশ। কে কোথায় চলে গেল! ডাকাবুকো শ্যামল এত জোরে বাইক চালাল, পৃথিবীর বাইরে চলে গেল। আমাদের ব্যাচে বিধানই খুব উন্নতি করেছে। এখন আমেরিকার 'নাসা'য় আছে। সায়েন্টিস্ট। খুব অভাবের মধ্যে দিয়ে বড়ো হয়েছে। হয়েছে তার মায়ের জন্যে। অমন মা বিরল। আমার দাদু বলতেন, জন্ম দিলেই মা হয় না। কোন্নগরে

গঙ্গার ধারে এক চিলতে একটা বাড়ি। ছোট্ট একটা কিচেন গার্ডেন। বিধানের বয়েস যখন তিন বাবা মারা গেলেন। মা মানুষ করলেন ছেলেকে। সে এক সংগ্রাম। বিধানের বাড়িতে প্রায় প্রতি রবিবারেই যেতুম। দুটো আকর্ষণে—গঙ্গা আর মাসিমার হাতের অসাধারণ রান্না। ভীষণ ভালোবাসতেন আমাকে। এখন আর যাই না। সঙ্কোচ। আমি তো কিছু হতে পারলুম না। একেবারে মিডিওকার। আমার বাবা দুঃখ করে বলতেন, হওয়ার ইচ্ছে না থাকলে কিছু হওয়া যায় না।

সুবীর বললে, 'কিছু মনে করিস না, আমাকে যেতে হচ্ছে, শেয়ালদার এক পার্টিকে টাইম দেওয়া আছে।'

সুবীরের নিজস্ব একটা ফার্ম আছে—ইলেকট্রিক্যাল কনট্র্যাকটার। বেশ ভালোই চালাচ্ছে। ব্যবসাদারের ফ্যামিলি। পরিবারের কেউ কখনো চাকরি করেননি। বড়োবাজারে পারিবারিক একটা ব্যবসা আছে হার্ডওয়্যারের। কলকাতায় তিনখানা বাড়ি।

সুবীর একটু অন্যরকমের। লেখাপড়ায় বেশ ভালো ছিল। শিবপুরের ইলেট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার। চাকরির অনেক সুযোগ এসেছিল। নেয়নি। হাতে বড়ো বড়ো প্রোজেক্ট। গ্রে স্ট্রিটে অফিস। কেন জানি না আমাকে ভালোবাসে। কখনো বন্ধু, কখনো আবার অভিভাবক। জীবনের পরামর্শ দেয়। মাঝে-মধ্যে শাসনও করে।

আমি একটা জরাজীর্ণ বাড়ির দোতলার একটা ঘরে থাকি। বাড়িটা আমার দাদুর। বেশ বড়ো বাড়ি। আমার দাদু একজন নামী মানুষ ছিলেন। ইংরেজির অধ্যাপক। বহুবার বিলেত গেছেন। আমার মা একমাত্র মেয়ে। ছেলে ছিল না। দিদিমা বাড়িটা আমাকে লিখে দিয়ে গেলেন। আমার আদর্শবাদী বাবা দান নেবেন না। বাড়িও করলেন না। ভাড়া বাড়িতে দিন কাটালেন। বাড়িটা পড়ে রইল তালা বন্ধ। বাবা ছিলেন কেমিস্ট। জঙ্গি শ্রমিক আন্দোলনে ল্যাবরেটারিটা নষ্ট হল। নেতারা নৃত্য করলেন। বাবা ওপরে চলে গেলেন। পড়ে রইলুম আমি আর আমার মা। ভাড়া বাড়ি ছেড়ে দিয়ে উঠে এলুম দিদিমার বাড়িতে।

বাড়িটা হন্টেড।

বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করবেন না। আমি বিশ্বাস করি। বিজ্ঞান মঞ্চে তরুণ বামপন্থী বিজ্ঞানীদের বক্তৃতা অনেক শুনেছি। আমার বিশ্বাস কিন্তু বদলায়নি। গভীর রাতে সারা বাড়িতে যে-বেহালার সুর ঘুরে বেড়ায়—কে বাজায়? সে-সুর বাইরে থেকে আসে না। তন্ন তন্ন করে খুঁজতে খুঁজতে, একতলার গুদাম ঘরে বিরাট একটা সিন্দুক আবিষ্কার করলুম। বিশাল তালা ঝুলছে। বিলেতের 'চাবস কোম্পানির' তৈরি। চাবি কোথায়? চাবি হারিয়ে গেছে। মা জানে না। সিন্দুকে কী আছে, তাও জানে না। পড়ে আছে—আছে।

মা হঠাৎ মারা গেলেন। রাত্তিরে খাওয়াদাওয়ার পর বারান্দায় বসে আমার সঙ্গে গল্প করছিলেন। ভবিষ্যতের গল্প। 'ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টে তোর চাকরিটা যদি হয়ে যায়, তা হলে তো তোকে ফরেস্টেই থাকতে হবে, তা হলে আমি কোথায় কার কাছে থাকব?'

'তোমাকে আমি মাথায় করে রাখব। আমার কাছে থাকবে তুমি। আমাকে একটা ফার্স্ট ক্লাস ফরেস্ট বাংলো দেবে। চারপাশে বড়ো বড়ো শাল আর সেগুন গাছ। বাংলোর সামনে সবুজ লন। ফুলের বাগান। একটু হেঁটে গেলেই একটা নদী। দূরে পাহাড়ের পর পাহাড়। তোমার হাঁস পোষবার শখ। তোমাকে আমি কুড়িটা হাঁস কিনে দোবো। সাদা কালো, পাঁশুটে রঙ। তুমি চই চই করে ডাকবে। তোমাকে গোল করে ঘিরে হাঁসগুলো প্যাঁক প্যাঁক করবে। মা সরস্বতীর একটা হাঁস আমার মায়ের কুড়িটা হাঁস।'

'বাঘ আসবে?'

'আসতেও পারে। তবে রোজই হাতি আসবে। বড়ো বড়ো হাতি।'

'আমি একটা কিচেন গার্ডেন করব'।

'কিচেন গার্ডেন কি গো, তোমার বিরাট বড়ো একটা বাগান হবে।'

'যাক বাবা, অনেক দুঃখের পর এইবার একটু সুখ, কী বল খোকা?' মা হেসে উঠলেন হাসিটা আচমকা কেটে গেল। শব্দ নেই। মুখে হাসি লেগে আছে। মা নেই। পাখি যে-ভাবে খাঁচা থেকে উড়ে যায় মায়ের প্রাণ সেই ভাবে উড়ে গেল।

অদ্ভুত আমার জীবন। কেউ আমার কথা একবারও ভাবলে না। সবচেয়ে আশ্চর্য হয়েছি মায়ের ব্যবহারে। এই নিষ্ঠুর পৃথিবীতে কেউ আর আমার রইল না। আমি বেঁচে থাকলেই বা কি, মরে গেলেই বা কী? কারো কিছু যায় আসে না।

মা চলে যাওয়ার পর শুরু হল আমার অন্বেষণ। বাড়িটার কোথায় কী আছে! ঘরের পর ঘর তালা বন্ধ। খোলার কোনো প্রয়োজন হত না। বড়ো বড়ো খাট, আলমারি, ড্রেসিং টেবল। আমলমারির ভেতর কতো কতো কাপড়, জামা। অতীতের চরিত্ররা পড়তেন। ড্রেসিং টেবলে কত রকমের সাজার জিনিস। চিরুনি, হেয়ার ব্রাশ। হাড়ের চিরুনির হাতল ফেটে ফেটে গেছে। হেয়ার ব্রাশের হেয়ার সব ডেলা পাকিয়ে গেছে। পারফিউমের শিশির সব গন্ধ উড়ে গেছে। আয়নার বেলজিয়ান কাচে ছোপ ধরে গেছে। সোফায় সাত পুরু ধুলো। খাটে পরিপাটি বিছানা-বালিশ। ধুলোয় সাদা। মশারি ওপরে গোটানো। দামি নেটের মশারি। হাত দিলেই ঝরে পড়ে যাবে।

একটা ঘরের মেঝেতে পাউডারের মতো ধুলো। তার ওপর ছোটো ছোটো পায়ের ছাপ। ছোটো তো কেউ ছিল না। কে এসেছিল এই ঘরে! এ এক রহস্য! মা থাকলে বলতে পারতেন। একবার মনে হয়েছিল মেঝেটা ভিজে ন্যাকড়া দিয়ে মুছে ফেলি—সাহস হয়নি।

নীচের গুদাম ঘরে ঢুকে অবাক। অসম্ভব ব্যাপার। এক পা এগোবার উপায় নেই। ভাঙা ফার্নিচার। হরেক রকমের বাক্স। হাভানা চুরুটের খালি বাক্স কমসে কম শ' দুই। মাতামহ চরুট খেতেন। এক ডজন বিলিতি ছিপ। গোটা কুড়ি হুইল। মাছ ধরা সুতো সমেত।

এই পৃথিবীতে আমার একমাত্র বন্ধু সুবীর। মা মারা যাওয়ার পর রাতে সে আমাদের এই বাড়িতে আমার সঙ্গে শুতে আসত। কোনো কোনো দিন কাজকর্ম তাড়াতাড়ি শেষ করে সন্ধের পরেই চলে আসত। সুবীরের হবি ছিল রান্না। নানারকম বাজার করে আনত। দুজনে রান্নাঘরে ঢুকে যেতুম। সর্বত্র মায়ের হাতের স্পর্শ। সুন্দর ভাবে সব গোছানো। কৌটোর গায়ে গায়ে লেবেল মারা। ধনে, জিরে, পাঁচফোড়ন। ময়দা, সুজি, চিনি, চা। সব বৈজ্ঞানিক কায়দায় সাজানো। বড়ো মানুষের মেয়ে, একমাত্র মেয়ে।

আমার মাতামহী প্রয়াগের কুম্ভমেলায় হারিয়ে গিয়েছিলেন। রহস্যের জট খোলা যায়নি। সারা ভারতের পুলিশ তন্ন তন্ন করে খুঁজেও আমার দিদিমাকে উদ্ধার করে আনতে পারেননি। দাদু প্রাইভেট এজেন্সিকে ভার দিয়েছিলেন। সন্ধান মেলেনি। সিদ্ধান্ত হয়েছিল, ডুবে গেছেন। অথবা, যেহেতু সুন্দরী ছিলেন দুর্বৃত্তরা ধরে নিয়ে গেছে।

দাদুর দুঃখ আমি বুঝি। চুরুট, বই, মাছ ধরা আর বিদেশ ভ্রমণ, নিঃসঙ্গ জীবনের এই হল সঙ্গী। সাত, আট খানা মোটা মোটা ডায়েরিতে লিখে রেখে গেছেন জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতা।

মায়ের রান্নাঘরে ঢুকলে প্রথম প্রথম আমার খুব কান্না পেত। সুবীর একদিন খুব বকাবকি করলে। পুরুষ মানুষ পুরুষ মানুষের মতো হবি। মেয়েদের চোখের জলের দাম আছে। পুরুষের চোখের জল দুর্বলতা। মৃত্যুর পৃথিবীতে মৃত্যু থাকবেই। কেউ আগে যাবে, কেউ পরে যাবে। কেউ কালে যাবে, কেউ অকালে। নাথিং ডুয়িং।

আমতা আমতা করে বলেছিলুম, 'স্মৃতি'।

সুবীর বলেছিল, 'একটা সুন্দরী মেয়ে এসে জাপটে ধরে চুমু খেলে চোখে জল থাকবে? মায়ের স্মৃতি ছেঁড়া কাগজের মতো উড়ে চলে যাবে। দুঃখ বাইরে প্রকাশ করবি না। ভেতরে ধরে রাখবি। দেখবি জীবনটা অন্যরকম হয়ে গেছে। দুঃখের সুখে ভরে উঠেছিস। সংগীত হয়ে গেছিস, বাউল হয়ে গেছিস, বসন্তের উদাস বাতাসের মতো। নে, বড়ো বড়ো দুটো পেঁয়াজ ডুমো ডুমো করে কাট।'

এই হল সুবীর। এক রবিবার সুবীর বললে, 'চল, সিন্দুকটা খোলার চেষ্টা করি।' যন্ত্রপাতি নিয়ে এসেছিল। ঘণ্টাখানেক মরণপণ, তালা খুলল। ভেতরে একটা ভেলভেট মোড়া বেহালার বাক্স। বাক্সটা কিন্তু খালি। বেহালাটা নেই। আছে পাট করা একটা সিল্কের রুমাল। এক কোণে মনোগ্রাম।

সুবীর বললে, 'ব্যাপারটা কী হল? বেহালাটা গেল কোথায়? এত যত্ন করে একটা খালি বাক্স! রহস্যজনক। চল তো দেখি।'

বাক্সটা নিয়ে আমরা বারান্দার রোদে এলুম। সুবীর মন দিয়ে পরীক্ষা করতে করতে কি একটা করল, তলাটা খুলে গেল। একটা গুপ্ত কন্দর। একগাদা সোনার গয়না, জড়োয়ার সেট।

আমাকে হা হা করে হাসতে দেখে, সুবীর বললে, 'কি হল? ম্যাড হয়ে গেলি?'

'গয়নাগুলোর কত দাম হবে?'

'অনেক।'

'আর আমরা কি অভাবেই না দিন কাটিয়েছি!'

পরের দিন আমরা দুজনে ব্যাঙ্কের লকারে গয়নাগুলো ঢুকিয়ে দিয়ে এলুম। শান্তি।

কিন্তু বেহালাটার কি হল? যে-বেহালা রাতে বাজে। সুবীর বললে, 'ছেড়ে দে। ও নিয়ে ভেবে সময় নষ্ট করিস না, তবে এই বাড়িটা একটা ট্রেজার হাউস। কি আছে তোরা জানিস না। জানার চেষ্টাও করিসনি।'

'কী করা উচিত?'

'অনুসন্ধান।'

'আমার একার দ্বারা সম্ভব নয়।'

'বাইরের লোক ঢোকালে হবে না। জানাজানি হয়ে যাবে। সে খুব বিপদের। মাসিমা খুব ক্যালাস ছিলেন।'

'না, মা ভয় পেতেন।'

'কীসের ভয়?'

'মা আমাকে প্রায় বলতেন, এই বাড়িটার ওপর আমার কোনো অধিকার নেই। তোর বাবা বলতেন অনুপার্জিত ধন একটা উৎপাত, একটা অভিশাপ। দান নিয়ে বড়োলোক হওয়ার চেয়ে ভিখিরি হওয়া ভালো। মা বলতেন, এর কোনো কিছুই আমার নয়। আছি, এই পর্যন্ত। নীচের তলায় তিনটে ঘরে আমাদের দুজনের সংসার।'

সুবীর কিছুক্ষণ গম্ভীর হয়ে রইল, 'ঠিক কথাই বলেছিলেন, তবু যখন হাতে এসেছে ফেলে তো আর দেওয়া যায় না। এত বড়ো একটা বাড়ি। একটু

অদল-বদল, মেরামত করে আমরা এখানে একটা হাসপাতাল করব। অনেকের উপকার হবে।'

'বড়ো কিছু ভাবতে ভালো লাগে, করাটাই কঠিন।'

'ইচ্ছের জোর থাকলে সবই করা যায়। ইচ্ছে থাকলেই উপায় বেরোয়। গয়নাগুলো লকারে ফেলে না রেখে বিক্রি করে দিলেই অগাধ টাকা।'

'কার গয়না কে বিক্রি করে!'

'কার গয়না মানে? তোর মায়ের গয়না।'

'আইনে আটকাবে না! যদি চোরাই মাল হয়?'

'তোর দাদু নিশ্চয় চোর ছিলেন না!'

"আমার দাদু বিখ্যাত ব্যক্তি ছিলেন। সেকালের ইতিহাসে হয়তো তাঁর নাম আছে।'

'হয়তো কী? অবশ্যই নাম আছে। অত বড়ো একজন ভাষাতত্ত্ববিদ! অ্যাকাডেমিক সার্কেলে, বিদগ্ধমহলে তিনি অমর।'

'তিনি বেহলা বাজাতেন না।'

'তোর দিদিমা?'

'শুনিনি।'

'এই বাড়ির ইতিহাস এই বাড়িতেই আছে। রবি, সোম, মঙ্গল—এই তিন দিন আমার তেমন কাজ নেই, এই তিন দিন আমরা দুজনে বাড়িটা ওলট-পালট করব।'

দুই

সন্ধেবেলা খবর এল চিন্ময়ী মারা গেছে। সুবীরকে ফোন করলুম। সুবীরের মোবাহলে।

'চিন্ময়ী চলে গেল! তুই কোথায়?'

'স্টক এক্সচেঞ্জে। একঘণ্টার মধ্যে আসছি। পোস্টমর্টেম থেকে ছাড়বে কখন? কারা গেছে?'

'ওদের বাড়ি থেকে কেউ এসে আমাকে কিছু বলেনি।'

'তবে? কী করবি?'

'কিচ্ছু করব না। তোর কাজ মিটে গেলে চলে আয়!'

একেবারে একা বসে আছি আমাদের বাড়িতে। দাদুর আমলের বৈঠকখানা ঘরে। একদিকের দেয়ালে অয়েলে আঁকা একটা পোর্টরেট ঝুলছে, স্যার উইলিয়াম জোন্‌স। ভারতে এসে ভারতচর্চার পথ খুলে দিলেন। স্থাপন করলেন

এশিয়াটিক সোসাইটি। ভারতত্ত্ববিদ। অসাধারণ পণ্ডিত। সুপ্রিমকোর্টের বিচারপতি। দাদু তাঁর ছবি আঁকিয়েছিলেন। শিল্পীর অস্পষ্ট স্বাক্ষর, 'পিয়ারী'। মনে হয় কোনো সায়েব। দাদুর সঙ্গে বড়ো মানুষের আলাপ ছিল।

যে-ঘরে বসে আছি, সেখান থেকে বড়ো রাস্তা বেশ কিছুটা দূরে। রাত নেমেছে শহরে। দূরের বড়ো রাস্তায় যান চলাচল বেড়েছে। এই সময় যা হয়। চিনুর কথা খুব মনে পড়ছে। এই বাড়ির এই ঘরে সে কতবার এসেছে। কত আনন্দ করেছে। মা চলে যাওয়ার পর, সাবধান করেছিলুম, 'আমি একা থাকি, তুমি একা আর এস না, পাঁচজনে পাঁচ কথা বলতে পারে।'

'বলে বলবে, আমি গ্রাহ্য করি না।'

'আমি যদি কিছু করে ফেলি!'

'আমিও তো কিছু করে ফেলতে পারি!'

দুজনে হা হা করে খানিক হাসলুম। ব্যাপারটা সহজ হয়ে গেল। আমাদের আলাপের জায়গাটা আমাদের কলেজ। আমি বেরোবার মুখে, চিন্ময়ী তখন ওপর দিকে উঠছে।

আলাপের উপলক্ষটা খুব মজার। হেদোর পাশ দিয়ে চিনু ট্রামরাস্তার দিকে এগোচ্ছে। আমি পেছনে। হঠাৎ গোটা চারেক কুকুর ঝটাপটি করতে করতে ঘাড়ে পড়ে আর কি! চিনু দু'হাতে আমাকে জাপটে ধরেছে। আমার বুকের সঙ্গে তার বুক লেগে গেছে। ধুকপুক করছে। দুজনের কপাল ঠেকাঠেকি। রাস্তার বাঁ ধারে প্রাচীনকালের বিখ্যাত, ঐতিহাসিক চায়ের দোকান। কড়া টোস্ট আর ডবল হাফ চায়ের জন্য সুখ্যাত। দোকানের রসিক মালিক আমাদের অবস্থা দেখে বললেন, 'হয়ে গেল।'

কুকুরগুলো মারামারি করতে করতে পেছন দিকে চলে গেল।

চিনু বললে, 'কী হল?'

'যা হবার তাই হল, এখন এখান থেকে আগে সরে পড়ি চল।'

আমরা বিডন স্ট্রিট ধরে সোজা হাঁটছি। তখনো জানি না, কে কোন দিকে যাব। কলেজে মেয়েদের দঙ্গলে হয়তো দেখেছি, মনে রাখিনি। প্রয়োজন হয়নি। ঘটনাটা ঘটে যাওয়ার পর ভালোবেসে ফেলেছি। পাগল হয়ে গেছি বললে ভুল হবে না। সামান্য ব্যাপার—একটি মেয়ে। দেহে দেহে ঠোকাঠুকি নয়, মনে মন ছুঁয়ে যাওয়া। চোখে চোখ লেগে যাওয়া।

এ-সব ভাবছি কেন আমি, যখন সে নেই। সারা ঘরে ছড়িয়ে আছে তার উপস্থিতির স্মৃতি। একদিন সকালে এসে বললে,

'তুমি কিছু পার না, একেবারে লেদাডুস।'

আমি ছুরি দিয়ে আলুর খোসা ছাড়াবার ব্যর্থ চেষ্টা করছিলুম। একটা খাপছাড়া ব্যাপার হচ্ছিল।

'দেখি, সরো। আলু কাটছ কেন?'

'মাছের ঝোল হবে।'

'কে রাঁধবে?'

'কেন? আমি রাঁধব।'

'সর্বনাশ! সে ঝোল মুখে দেওয়া যাবে? মাছটা কে কাটবে?'

'বাজার থেকে কাটিয়ে এনেছি।'

'কি মশলা দেবে?'

'ধনে, জিরে, হলুদ কাঁচালঙ্কা ফেঁড়ে দোবো।'

সে নিজেই রান্নায় লেগে গেল, আমি জোগাড়ে। সুন্দর কপালে দু-এক গাছা চুল ঝুলে পড়েছে। গলার চারপাশে বিন্দু বিন্দু ঘাম। একটা সরু সোনার চেন গায়ের রঙের সঙ্গে মিশে গেছে। গোল গোল হাতে একটা করে চুড়ি। সে-হাতের কি কায়দা! কানে ছোটো ছোটো দুটো ইয়ারিং। হালকা হলুদ রঙের শাড়ি সাদা ব্লাউজ। ফর্সা ফর্সা পা দুটো আমার চারপাশে নেচে বেড়াচ্ছে। আমি মেঝেতে থেবড়ে বসে আছি। চারপাশে ঘটিবাটি, জলের বালতি। মাঝে মাঝে হুকুম হচ্ছে, এটা দাও ওটা দাও।

সেদিন আমরা দালানে একসঙ্গে খেতে বসেছিলুম।

'কি, কেমন রেঁধেছি?'

'দুর্দান্ত।'

'ঝাল লাগছে? আমি একটু ঝাল বেশি খাই।'

'আমিও। মা বলতেন, ঝাল খেলে বুদ্ধি খোলে।'

সে-দিন আমার একটা কথাই মনে হচ্ছিল চিনু আমার বোন নয় বউ। এত এত মানুষের মধ্যে থেকে হাত ধরাধরি করে দুজনে বেরিয়ে এল। সেই দুজনই তখন জগৎ। তাদের সম্পর্ক, সুখ-দুঃখ, বেঁচে থাকা, মরে যাওয়া । চিনু আমার বুকটা খালি করে দিয়ে চলে গেল। আমার আশ্রয় চুরমার। পড়ে আছি ফাঁকা মাঠে। পাশ দিয়ে সবাই সব দিকে চলে যাচ্ছে। কেউ যেন সিগারেট ধরিয়ে কাঠিটা ফেলে দিয়ে গেছে!

ধ্যাৎ, ধ্যাৎ!

তিন

সুবীর এল। দেরিতে এল। ক্লান্ত দেখাচ্ছে। খুব খাটে। একা অত বড়ো একটা ব্যবসা চালায়। আমাকে বলেছিল, কি চাকরি করবি, আমার সঙ্গে আয়। আমি বলেছিলুম, না, ভাই আমাদের এই সুন্দর বন্ধুত্ব নষ্ট করতে চাই না।

সুবীর আসার সময় খাবার নিয়ে এসেছে। আমাদের দুজনেরই যা প্রিয়, হিং-এর কচুরি। রাতে আর কিছু খেতে হবে না। এইতেই হয়ে যাবে।

'হ্যাঁ রে, ওদিকের কোনো খবর আছে?'

'পোস্টমর্টেম হবে। কাল দুপুরের আগে বেরোবে না।'

'আমরা কিছু করতে পারি?'

'কী করবি, ওদের অনেক লোকজন!'

আমরা কথা বলছি, দরজার কাছে কে একজন এসে দাঁড়াল। বাইরের দালানে আলো জ্বলছে। লম্বা একটা ছায়া ঘরে এসে ঢুকেছে। দরজায় দাঁড়িয়ে আছে একটি মেয়ে। বেশ ভয় পেয়ে গেছি।

মেয়েটি সামনে এসে দাঁড়াল। চিনতে পেরেছি। চিন্ময়ীদের বাড়ির সর্বক্ষণের কাজের মেয়েটি।

'কী রে রুমকি?'

রুমকি খুব নীচু গলায় প্রায় ফিসফিস করে বললে, 'ভেতরের ঘরে চলো, অনেক কথা আছে।'

রুমকিকে নিয়ে শোবার ঘরে গেলুম। সে চেয়ারে বসল। আমি আর সুবীর খাটে। রুমকি খুব স্মার্ট। চেয়ারটা সরিয়ে আনল খাটের কাছে।

'দিদিকে ওরা খুন করেছে।'

'সে কী? কে খুন করেছে?'

'ওর মা আর ওর কাকা!'

'সে আবার কী?'

'ওই কাকা খুব বাজে লোক। চিনুদির মায়ের সঙ্গে একটা ব্যাপার আছে। এই নিয়ে দিদির সঙ্গে খুব অশান্তি হত। সম্পত্তি দিদির নামে। চিনুদির বাবার সঙ্গে চিনুদির মায়ের সম্পর্ক খুব খারাপ ছিল। মা আর মেয়েতে যখন ঝগড়া হত তখন সব শুনেছি। অনেক বিচ্ছিরি বিচ্ছিরি ব্যাপার আমি আড়াল থেকে দেখেছি।'

'সে হোক, মেরে ফেলেছে বলছ কেন?'

'এই টুকরো কাগজটা আমি পেয়েছি, পড়ে দেখ।'

কাগজটায় একটা লাইন, 'অঙ্ক মেলাতে পারলেই পথ পরিষ্কার।'

'এটা কার হাতের লেখা।'

'কাকাবাবুর।'

'এর মানে কী?'

'পথ পরিষ্কার মানে কি! একদিন রাত্তিরে, এই সাত-আট দিন আগে দিদি মাকে বলেছিলো, তোমরা এই বাড়ি ছেড়ে চলে যাও।'

'চিনু মারা যাওয়ার পর বাড়ি, সম্পত্তি কে পাবে?'

'কাকাবাবু।'

'মা পাবে না কেন?'

'মায়ের অধিকার নেই। পৈতৃক সম্পত্তি সেই তরফেই ফিরে যাবে।'

'কে বললে?'

'প্রশান্তদা, হাইকোর্টের। আমি সকালেই জিগ্যেস করে জেনে এসেছি।'

সুবীর বললে, 'এ তো অসাধারণ মেয়ে, এর ব্যারিস্টার হওয়া উচিত।'

রুমকি হাসল। কপালে টোকা মেরে বললে, 'মানুষের এই জায়গাটাই সব। যা লেখা আছে তাই হবে।'

'তা হলে ব্যাপারটা কি দাঁড়াচ্ছে?'

'অঙ্ক। ব্যাপারটা অঙ্ক। দুই আর দুয়ে চার। মন দিয়ে শোনো অঙ্কটা কি! তোমার আর দিদির সম্পর্কটা বিয়ের দিকে যাচ্ছিল। বিয়ে তোমাদের হতই। অর্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা দুটোই তুমি পেতে। তাহলে রাজকন্যাকে সরাতেই হবে। এইবার শোনো, দিদির বাবা বেঁচে থাকতেই ঠাকুরপো আর বউদির লটঘট চলছিল। শোনো, খুন একটা নয়, খুন দুটো। দিদির বাবাকেও খুব কায়দা করে সরানো হয়েছিল।'

'কী রকম?'

'আজ থেকে সাত বছর আগে লরি দিয়ে চাপা দেওয়া হয়েছিল।'

'কাকাবাবু লরি কোথা থেকে পেল?'

'সেই সময় ট্র্যানসপোর্ট বিজনেস ছিল। দিদির বাবা ডানকুনির কোল কমপ্লেকসে ছিলেন। সন্ধের সময় মটোর সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। লরিটা মেরে দিয়ে চলে গেল। একটা জায়গায় অঙ্কটা গোলমাল হয়ে গেল, ওরা জানত না তিন মাস আগেই বাবা উইল করে মেয়েকে সব সম্পত্তি দিয়ে গেছেন। সলিসিটারের ঘরে সেই উইল জমা ছিল। কেস কেঁচে গেল। এইবার কি হল, বউদিকে ভোগ করা হয়ে গেছে। বউদিকে বাঁচতে হবে মেয়ের দয়ায়, অতএব বউদিকে আর দরকার নেই। তখন বউদির সঙ্গে প্ল্যান হল, সম্পত্তিটা যদি পাইয়ে দিতে পারে তাহলে তুমি হবে আমার পাটরানি।'

'আগুনটা লাগল কী করে?'

সুবীর বললে, 'গ্যাস খুলে রেখেছিল।'

রুমকি বললে, 'অত বোকা নয়। গ্যাসের গন্ধ আছে।'

'তাহলে।'

'ওই যে বলেছে, অঙ্কটা যদি মেলাতে পার! ভালো করে শোনো, চোখ বুজিয়ে দেখ। দেশলাই কাঠি জ্বলল, ডান হাত এগোচ্ছে। বাঁ হাতে ওভেনের নবটা ঘোরানো হল, হঠাৎ আচমকা একগাদা বাসন পড়ল। চমকে উঠল। জ্বলন্ত কাঠিটা পড়ল নাইটির ওপরে। গ্যাস খোলা। হু হু করে বেরোচ্ছে। সেই গ্যাস আগুনকে দাউ দাউ করে বাড়িয়ে দিল। প্রথম চান্‌সেই হিসেব মিলে গেল।'

আমি আর সুবীর হাঁ করে বসে রইলুম কিছুক্ষণ।

সুবীর বললে, 'পারফেক্‌ট মার্ডার। কোনো ভাবেই প্রমাণ করা যাবে না।'

'একটা কথাও তো বলতে পারল না। বললে কিছু করা যেত হয়তো।'

'পোস্টমর্টেম?'

'কী পাওয়া যাবে? কিস্যু পাওয়া যাবে না। ভিসেরায় কিছু মিলবে না। যদি এফ. আই. আর. করতে হয় কে করবে? এ তো শ্বশুরবাড়িতে বউ পোড়ানো নয়। আমরা তো বাইরের লোক। ঘটনার জায়গায় ছিলুম না। প্রত্যক্ষদর্শী নয়। সাক্ষীও হতে পারব না।'

রুমকি বললে, 'কোনো খুনই কি কেউ দেখিয়ে করে!'

'তা করে না, তবে কিছু না কিছু প্রমাণ ফেলে যায়। এখানে তো কিছুই নেই।'

রুমকি বললে, 'কেন এই কাগজটা।'

'এটা পেলে কোথায়?'

'দিদির মায়ের মাথার বালিশের তলায়। বিছানা করতে গিয়ে পেয়েছি।'

সুবীর বললে, 'আমার প্রথম প্রশ্ন, এটা যদি নির্দেশ হয়, পড়ে ছিঁড়ে ফেললেই হত। যত্ন করে বালিশের তলায় রাখা কেন? প্রমাণ তো লোপাট করারই কথা।'

'অসাবধানতা। ভুলে গেছে। আমার ধারণা, যেই আনুক এটা এসেছিল রাত্তিরবেলা। পড়ার সময় দিদি হঠাৎ ঘরে ঢুকে পড়েছিল। তাড়াতাড়ি বালিশের তলায় ঢোকাতে গিয়ে ঢুকিয়ে ফেলেছিল ওয়াড়ের ভেতর। পরে আর খুঁজে পায়নি।'

'ঠিক আছে, এটা ধরে রাখা যাক, পরের প্রশ্ন, যাদের দু'বেলা দেখা হচ্ছে, এত ঘনিষ্ঠ, তাদের একজন আর একজনকে চিরকুট দেবে কেন, কায়দার কথা লিখে! কানে কানে ফিসফিস করে বললেই তো হয়।'

রুমকি একটু চিন্তিত হল।

'এই জায়গায় আমরা একটা কমার্শিয়াল ব্রেক নি।' সুবীর বললে। 'কচুরিদের যথা স্থানে পাঠানো দরকার, বিলম্বে আরো শীতল হয়ে যাবে। তোর জায়গা-জমি বের কর।'

উঠে রান্নাঘরে গেলুম। রুমকি আমার পাশে এসে দাঁড়াল, 'তুমি যাও। আমি ব্যবস্থা করছি।'

আমাদের সামনে কচুরি আর তরকারির প্লেট ধরে দিল।

'তোমার?'

'আনছি। হাত তো দুটো।'

সুবীর বললে, 'তাও তো বটে।'

রুমকি এসে বসল।

'সমান ভাগ করেছ তো!'

'আমার একটা কম।'

'কেন? বারোটা এনেছি তো!'

'তুমি বারোটার দাম দিয়েছ, কচুরি দিয়েছে এগারটা।'

'আমাদের থেকে হাফ হাফ নাও।'

'খাও তো। আমার ভীষণ খিদে পেয়েছে। সকাল থেকে উপোস, ও বাড়িতে শোকের নকশা চলছে। এরপর চা খাবে তো!'

'যদি কর।'

'যন্ত্রপাতি দেখিয়ে দাও।'

আমার মা খুব গোছানো ছিলেন। সংসারটাকে করে রেখেছিলেন ছবির মতো। বড়ো ঘরের মেয়ে ছিলেন তো।

'এই নাও কেটলি!'

'কেটলি তো দেখতেই পাচ্ছি, কত বছর ধোওয়া হয়নি!'

'রোজ চা করি, সপ্তাহে একদিন আচ্ছাসে ধোলাই করি।' 'চা কোথায়, চিনি কোথায়, দুধ কোথায়?'

'সব আছে।'

সুবীর চায়ে চুমুক দিয়ে বললে, 'কাকাবাবু নয়, তৃতীয় আর একজন কেউ আছে। চিরকুটটার সঙ্গে এই মৃত্যুর যদি যোগ থাকে, তাহলে কাকাবাবু এর মধ্যে নেই।'

রুমকি বললে, 'হতে পারে। কাকাবাবু আজ তিন মাস কলকাতার বাইরে।'

'তাহলে, এই তৃতীয় লোকটা কে? তার সঙ্গে চিনুর মায়ের কী সম্পর্ক? তুমি কী আর কোনো লোককে বাড়িতে আসতে দেখেছ?'

'না।'

'তা হলে?'

আমি বললুম, 'সুবীর, এই সমস্যার সমাধান আমাদের দিয়ে হবে না। আমাদের সঙ্গে পড়ত প্রশান্ত, মনে আছে তোর?'

'বারুইপুরে আমবাগান, আমরা পিকনিক করেছিলুম।'

'প্রশান্ত পুলিশের বড়ো অফিসার। চল, কাল আমরা তার কাছে যাই।'

রুমকি বললে, 'আমিও যাব। রান্নাঘর, যেখানে আগুন লেগেছিল, দিদি মেঝেতে পড়ে গড়াগড়ি দিয়েছিল, সেই মেঝেতে পোড়া আঙুল দিয়ে কিছু একটা লেখার চেষ্টা করেছিল। চারটে অক্ষর। প্রথমটা মুছে গিয়েছিল। অক্ষর তিনটে যা পরিষ্কার বোঝা যাচ্ছিল, বিনাশ।'

'বিনাশ মানে, শেষ করে দেওয়া, হত্যা।'

'আগে আর একটা অক্ষর ছিল। ছিলই ছিল।'

সুবীর বললে, 'আজকের মতো এই পর্যন্ত থাক। কাল তো আমরা প্রশান্তর কাছে যাবই। একটা ফোন কর না।'

'নম্বর জানি না।'

'আমি তা হলে আজকের মতো ছুটি নিচ্ছি।'

রুমকি বললে, 'আমি কোথায় যাব?'

'কেন? ও বাড়িতে!'

'আজ সকালে আমাকে ওরা ছুটি করে দিয়েছে।'

'সে কি!'

'গম্ভীর গলায় বললে, দরকার নেই।'

'তোমার মালপত্র?'

'ওই যে, দুটো স্যুটকেস।'

সুবীর বললে, 'কি ব্যাপার বল তো? এত তাড়াতাড়ি বাড়ি ফাঁকা!'

'মনে হয়, রুমকিকে সন্দেহ করছে।'

রুমকি বললে, 'কিছু কাগজপত্র কাল ছাতের ঘরে পোড়াচ্ছিল। আমি জিগ্যেস করলুম, কি পোড়াচ্ছ? তা আমার দিকে কটমট করে তাকাল।'

'কী পোড়াচ্ছিল মনে হল?'

'অনেক খাতা-মাতা, চিঠিপত্তর।'

সুবীর বললে, 'এই রে, আগুনের নেশা ধরেছে। আগুনের একটা বিশ্রী নেশা আছে। তাহলে রুমকির কি হবে?'

রুমকি করুণ গলায় বললে, 'সুবীরদা আজ তুমি থেকে যাও না। আমি কে, সেটা তোমার জানা হয়নি। তোমরা দুজনেই জান না। কাল সকালে আমি কোথায় না কোথায় চলে যাব, আর তো দেখা নাও হতে পারে।

সুবীর বললে, 'অল রাইট! তুমি যদি খিচুড়ি খাওয়াও তাহলে থেকে যেতে পারি।'

রুমকি বললে, 'খিচুড়ি আর পাঁপড় ভাজা।'

সুবীর আমাকে জিগ্যেস করলে, 'কিরে কাঁচামাল সব আছে তো? 'পাঁপড় আনতে হবে।'

'আমি যাচ্ছি। ভালো করে দেখ, চাল, ডাল, আলু সব আছে তো? ঘি আছে? খিচুড়ি কিন্তু ঘি চাইবে।'

'ঘি আছে।'

রুমকি বললে, 'খিচুড়ির সঙ্গে ডিমের ওমলেট?'

'ওঃ! ভেরি ইন্টারেস্টিং। ফাটাফাটি।'

সুবীর বেরিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে ফিরে এল।

'কি হল রে?'

'শোন শুভ্র, তোদের ওই আউট হাউসে কেউ থাকে?'

'না তো, ওটা তো প্রায় ভেঙে পড়েছে। সাপ-খোপের আড্ডা।'

'বিশ্বাস কর, একটা দেশলাই কাঠি জ্বলেই নিবে গেল।'

'সে কি রে?'

রুমকি আমার গায়ের সঙ্গে সেঁটে গেছে।

সুবীর বললে, 'সামওয়ান ইজ দেয়ার, আই অ্যাম সিওর। একবার দেখা দরকার।'

রুমকি বললে, 'আমাকে মারবে।'

'তোমাকে মারবে কেন?'

'আমার মন বলছে। আমি একটা বিরাট চক্রর সন্ধান পেয়েছি।'

সুবীর বললে, 'টর্চ আছে?'

ঝোপ-জঙ্গল মাড়িয়ে, বুনো গাছের ডালপালার খোঁচা সহ্য করে অতীতের সেই কুঠিয়ায় দুজনে পৌঁছলুম। আমার মাতামহ যখন জীবিত ছিলেন তখন এই ঘরে একটা দাতব্য হোমিও চিকিৎসালয় করেছিলেন। আউট হাউসের পরেই বাউন্ডারি ওয়াল। তারপরেই বিরাট স্কুলবিল্ডিং। খাড়া দেয়াল ওপর দিকে উঠে গেছে। মাঝখানে ছোট্ট একটা গলি। পাক মেরে পৌঁছে গেছে শ্মশানে। গঙ্গা। প্রাচীন ঘাট। লঞ্চ সার্ভিস, জেটি।

সুবীর ঘরে আলো ফেলল। কেউ নেই। বাতাসে সিগারেটের গন্ধ। মেঝেতে দুটো সিগারেটের টুকরো। তিন-চারটে পোড়া দেশলাই কাঠি। টর্চের আলো ঘোরাতে ঘোরাতে দেয়ালের একটা জায়গায় একটা লেখা চোখে পড়ল। কাঠকয়লা দিয়ে কেউ লিখেছে,

নাক গলালেই বিপদ

লেখাটার পাশে একটা ত্রিশূল চিহ্ন। মেঝেতে আরো একটা কি পড়ে আছে। টর্চের আলো ফেলে দেখা গেল, চিবিয়ে চিবিয়ে প্রায় বিধ্বস্ত করে একটা মুরগীর ঠ্যাং কেউ ফেলে গেছে।

ঘরের কোণে হঠাৎ আলোয় কি একটা ঝলমল করে উঠল। সুবীর ভালো করে দেখে একটা শব্দ করল 'হুঁ'।

ওপাশে অনেক কালের ভাঙাচোরা টেবিল পড়েছিল। সুবীর তার তলায় একটা বাজে জিনিস আবিষ্কার করল।

'তুই খুব বিপদে পড়ে যাবি শুভ্র। এই ঘরে ড্রাগ-অ্যাডিক্টরা আসে। মেয়েরাও আসে। তোর কোনো নজর নেই। এই ঘরে খুন করে কারোকে ফেলে গেলে তোকেই তো জেল খাটতে হবে।'

'দেয়ালে লেখাটা?'

'ওটা কোনো নাবালকের কাজ। পাশেই স্কুল। বাউন্ডারিটা তেমন উঁচু নয়। টপকে চলে এসেছিল, রোজই হয়তো আসে। ডিটেকটিভ উপন্যাস পড়ার ফল। হয়তো তাদেরই কেউ এসে ব্রাউন-সুগার নেয়। রাংতাটা তারই সাক্ষী। কাল সকালে আমার ফার্স্ট কাজ হবে, এই ঘরটাকে ভেঙে মাঠ করে দেওয়া।'

পাঁচিলের পাশের সরু পথ দিয়ে মৃতদেহ নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে। পায়ের দুপদাপ শব্দ। মাঝে মাঝে ভারি গলায়, বল হরি হরি বোল। গা ছম্ ছম্। সুবীর বললে, 'চল, এর পর দোকানপাট সব বন্ধ হয়ে যাবে।'

রাত হয়েছে। বাজারে তেমন লোকজন নেই। কোনো কোনো দোকান বন্ধ হওয়ার মুখে। সবচেয়ে বড়ো কাপড়ের দোকান, বসাক স্টোর্স। দোকানের মালিক সারাদিন পা মুড়ে গদিতে বসে থাকেন। দোকান বন্ধ হওয়ার আগে কাপড় মাপার গজ কাঠিটা মেঝেতে দাঁড় করিয়ে দুহাত দিয়ে ধরে ওঠবোস করছেন। পয়সা প্রচুর কিন্তু গৃহসুখ আর দেহসুখের অভাব। বড়ো মেয়েটি একের পর এক প্রেম করতে করতে শেষ প্রেমের প্রেমিকের সঙ্গে হাওয়া। কোন দেশে গেছে কেউ জানে না।

বাজারের পেছন দিকে ছোট্ট একটি গণিকাপল্লী। রাত্তিরে বেশ জমজমাট হয়। একটা লাল বিরাট মটোর সাইকেল একপাশে খাড়া। মালিক কোনো একটা

ঘরে আয়েস করছে। মালিককে আমরা সবাই চিনি। রায়বাহাদুরের নাতি। তোলাবাজ। খুনটুনও করে।

ছোটো ছোটো খুপরি খুপরি ঘর। করুণ চেহারার একটি মেয়ে দরজায় দাঁড়িয়ে। সুবীরকে বললে, 'এস না আমীর।'

সুবীর কেঁদে ফেলেছে। 'শুভ্র! মেয়েদের এই পরিণতি সহ্য করতে পারি না।'

মেয়েটার হাতে একশো টাকার একটা নোট গুঁজে দিতে গেল।

মেয়েটা পরিষ্কার বলছে কানে এল, 'কাজ না করে পয়সা নিতে পারব না। আমাদের নিয়ম নেই।'

সুবীর বললে, 'তুমি আমার বোন।'

মেয়েটার কাটা কাটা উত্তর, 'বোন, তা বাড়ি নিয়ে চলো না।'

খদ্দের এসে গেল। একটা আধবুড়ো। কাঁধে একটা ব্যাগ। মদের গন্ধ। মেয়ের বয়সী মেয়েটার হাত খামচে ধরে ভেতরে চলে গেল। দরজা বন্ধ হয়ে গেল।

লোকটি আমার চেনা। বাজারে ইলেকট্রিক্যাল গুডসের চালু দোকান। বউ আছে, ছেলেমেয়ে আছে।

সুবীর ফেরার পথে, সারাটা পথ একটা কবিতা আবৃত্তি করতে করতে এল,

ধরণী তোমার প্রমোদপ্রবাস,
বাঁধনিক হেথা ঘর,
বিশ্বসুদ্ধ বুকে টেনে, বল
সবাই আমার পর।
পুণ্য তোমারে করে না লুব্ধ,
পাপে নাকি কাঁপে বুক!
নহ মা ঘৃণ্য কৃপার পাত্র,
আজ যে বুঝেছি খাঁটি—
মায়ের পূজায় কেন লাগে তোর
চরণে দলিত মাটি!

বাড়িতে ঢোকার মুখে সুবীর আমার একটা হাত ধরে বললে, 'আয় আজ রাতে আমরা শপথ করি—মেয়েদের আমরা খুব যত্ন করব।'

রুমকি ভয়ে সিঁটিয়ে আছে।

'কীসের ভয়?'

'এত বড়ো একটা বাড়িতে আমাকে একলা ফেলে চলে গেল। গেলে তো গেলেই। কত রকমের শব্দ!'

'ভয় পেলেই ভয় মানুষকে পেয়ে বসবে। এখন চল রান্নাঘরে। শুরু হোক আমাদের সমবেত রন্ধনযজ্ঞ।'

রুমকি জিগ্যেস করলে, 'কি ডাল?'

'মুসৌরি।'

'পেঁয়াজ চলবে?'

'লাগাও প্যাঁজ।'

সুবীর পেঁয়াজ ছাড়াচ্ছে আর গাইছে—

জীবনে মরণে সমপরিমাণে
মিলায়ে কে রাঁধে এ জগা-খিচুড়ি!
সরাচাপা ব্রহ্মাণ্ড-ভাণ্ডে
নুনে ঝালে অভাব রাখেনি কিছুরই!
নেপথ্যে হাঁকে কর্তা বাঙ্গাল—
জ্বাল ঠেলে দাও গণ্ডা গণ্ডা ঝাল;
বাকি কোনো দিকে রাখে না খেয়াল—
ঝি-চাকরে করে সকল খিচুরি।

সুবীর হঠাৎ নাচতে লাগল—

গুমে গুমে সিজে কাহার জন্য
ভূচর-জলচর-খেচরান্ন,
তলা হতে সরা, সরা হতে তলা
মাথা ঠুকে মরে আছাড়ি বিছুরি!

'এমন প্রলয় নাচ নাচলে রান্না করা যায়?'

সুবীর শান্ত হতে হতে,

'যে রাঁধুক আর যেই এরে খাক
এ খিচুড়ি নাহি হবে পরিপাক।
দেবতার পেট না হলেও ঢাক
অন্তত ফুলে হবেই কচুরি।'

রান্নাটা খুব জমেছে। সুগন্ধে বাড়ি ভরে গেছে। মা চলে যাওয়ার পর এই প্রথম। রান্না শেষ করে রুমকি বললে, 'চান করব।'

'কোনো অসুবিধে নেই। চলে যাও, ওই বাথরুম। সব আছে।'

খাওয়াদাওয়া শেষ হল প্রায় বারোটা। সুবীরকে খুব খুশি লাগছে। ও সাধারণত খুব ধীর স্থির। ওর মন বোঝা যায় না।

চার

আমাদের সেই সাবেক কালের বিরাট খাট। অকারণ কারুকার্য। সেকালে কাঠ শস্তা, বড়োলোকদের তবিলে বাজে খরচ করার মতো অঢেল টাকা। সুবীর শুয়ে পড়েছে। প্রচণ্ড খেয়েছে। আমি আর রুমকি খাটের আর এক পাশে বসেছি।

মা বেঁচে থাকলে এইভাবে একই খাটে তিনজনে বসা যেত কী?

রুমকি সুবীরকে বললে, 'তুমি শুয়ে শুয়ে শুনবে, তবেই হয়েছে। এক্ষুনি নাক ডাকাবে।'

সুবীর বললে, 'আমার ইনসমনিয়া আছে ভাই। বছরের পর বছর নিদ্রাহীন রাত আমার।'

'ঘুমোতে পার না কেন? এর পর তো পাগল হয়ে যাবে।'

'পাগল হতে আর বাকি কী? কত রকমের সমস্যা! জীবন-মরণ সমস্যা। এই প্রতিযোগিতার দুনিয়ায় বেঁচে থাকাটা যেন কুস্তি! আমার কথা থাক, তোমার কথা বল।'

'তা হলে শোনো। চিনুদির এই কাকাবাবু তার আমার বাবা, দুজনে হলার গলায় বন্ধু। পার্টনারশিপে ব্যবসা শুরু হল স্ক্র্যাপ আয়রনের। হাওড়ায় বিরাট গোডাউন। ক্যানিং স্ট্রিটে সাজানো, সুন্দর অফিস। দেখতে দেখতে ব্যবসা জমে উঠল। কত সুখ!

'এইবার শুরু হল কাকাবাবুর খেলা। বাবাকে মদ আর মেয়েছেলে ধরাল। আমার অত সুন্দর মা জীবন থেকে ভেসে গেল। প্রথমে লুকিয়ে লুকিয়ে তারপর খোলাখুলি। জলের বদলে মদ। মাকে ধরে পেটানো। একজন নিভাঁজ নিপাট ভদ্রলোক—চোখের সামনে একটা কুৎসিত ছোটোলোক হয়ে গেল। এইবার হল সিফিলিস। লোকটা কি ভয়ংকর শয়তান, ওই বিশ্রী রোগটা আমার নিরীহ মাকে ধরাবে বলে রোজ রাতে আমাদের চোখের সামনে আঁচড়া-আঁচড়ি, কামড়া-কামড়ি। মা চিৎকার করছে। একদিন দরজা ভেঙে ঘরে ঢুকতে হল। সে-দৃশ্য ভাবা যায় না। মদের ঘোরে বেহেড। মদের বোতলটাকে ভেঙে হাতে নিয়েছে। মায়ের পোশাক ছিন্নভিন্ন। লোকটার মুখ বীভৎস রাক্ষসের মতো। সম্পূর্ণ উলঙ্গ। জানোয়ারের মতো শব্দ করছে।

'মারলুম তলপেটে এক লাথি। কোঁক করে উঠল। আচমকা ভাঙা বোতলটা ঢুকিয়ে দিল আমার দুই উরুর মাঝখানে। সে রাতে নির্ঘাৎ আমার মৃত্যু হত। অথবা আমার হাতেই জানোয়ারটার মৃত্যু হত। ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়ছে। এই দৃশ্য দেখে মা আর স্থির থাকতে পারল না। তখন মা আমার মা দুর্গা। জানোয়ারটাকে

মারতে মারতে সিড়ি দিয়ে ফেলে দিল। গড়াতে গড়াতে দোতলা থেকে একতলায়।

'সুবীরদা বিরক্ত হচ্ছে! বই বন্ধ করব?'

সুবীর উঠে বসল, 'চা খাব।'

রুমকি উঠে দাঁড়াল, 'জান তো, সোজা হয়ে দাঁড়াতে গেলে এখনো শিরায় টান ধরে।'

সুবীর বললে, 'তোমরা বোসো, আমি চা করে আনছি, রুমকি বললে, 'আমি কি করতে আছি। একটাই সমস্যা, ওদিকে একা যেতে ভয় করছে।'

'চলো, আমরা তিনজনে যাই। শুভ্র! গুমটি ঘরটা একবার দেখে এলে কেমন হয়!'

'অসম্ভব! আমার যাওয়ার সাহস নেই। চুপ, চুপ একদম চুপ। সেই বেহালা। শুনতে পাচ্ছিস? কে বাজায়!'

রুমকি, 'ওরে বাবারে', বলে দু'হাতে জড়িয়ে ধরল।

ঠিক এই ভাবেই অনেক দিন আগে কুকুরের তাড়া খেয়ে চিনু আমাকে পথের মাঝে জড়িয়ে ধরেছিল। এ মেয়ে আলাদা মেয়ে, আলাদা শরীর, কিন্তু মনটা সেই এক।

সুবীর বললে, 'ভয় কীসের, একটা কবিতা শোন,

আমি বোধ হয় কোন জীবনে,
দূর অতীতের কোন ভুবনে,
ছিলাম কোন গুণীর হাতের বেহালা
অকারণের কান্না-হাসি
মুখে যে মোর উঠছে ভাসি
এ বুঝি সেই পুবজনমের দেয়ালা।'

'তোমার ভয় করে না সুবীরদা?'

'ভয় করবে কেন, কেউ তো আমাকে মেরে ফেলতে আসছে না। সাধু-সন্তরা বলে গেছেন, রাতের পৃথিবীতে অনেক রকম শব্দ ওঠে, আকাশে অনেক কিছু দেখা যায়। মানুষ ঘুমোয় তাই জানতে পারে না। পাশেই আবার গঙ্গা, মহাশ্মশান। চল না, ছাতটা একটু ঘুরে আসি। খুব ভালো লাগবে।'

'সে সাহস নেই ভাই।'

'কি আশ্চর্য! তোর বাড়ির ছাত, তুই ভয় পাচ্ছিস যেতে!'

বেহালার শব্দ ক্রমশ দূর থেকে দূরে চলে গেল। কে যেন বাজাতে বাজাতে মহাকাশে মিলিয়ে গেল।

এক রাউন্ড চা হল। বাইরের বাগানের ঝোপঝাড়ের মধ্যে একটা ঝটাপটির আওয়াজ হল। একটা বেড়াল একবার মাত্র 'ম্যাও' করে থেমে গেল। একটা ছায়া বাইরের দালান অতিক্রম করে চলে গেল। আমরা তিনজনে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে অছি। রান্নাঘরে একটা স্টিলের গেলাস কোনো কারণ নেই ভীষণ শব্দ করে তাক থেকে মেঝেতে আছড়ে পড়ল। একটা পরিচিত সুগন্ধ নাকে এল।

সুবীর বললে, 'কেউ ধূপ জ্বালিয়ে পুজোয় বসেছে।'

রুমকি কানে কানে বললে, 'গন্ধটা চিনতে পারছ?'

'পারছি।'

'তোমার কাছে দিদি এসেছিল, আমরা আছি দেখে চলে গেল।'

বোধ হয় একটু আবেগ এসেছিল। বুকের কাছটা কেমন করে উঠল। রুমকি আমাকে তার নরম শরীরে জড়িয়ে ধরে বললে, 'আমি আছি। আমি তোমাকে যেদিন দেখেছি সেই দিনই ভালোবেসে ফেলেছি।'

সুবীর টয়লেটে গিয়েছিল। দরজা খোলার শব্দ হতেই রুমকি দূরে সরে গেল।

শেষ রাতে যদি কোনো সুন্দরী বলে, 'ভালোবাসি', বুকের ভেতরে ভোরের পাখি ডেকে ওঠে।

সুবীর বললে, 'একটা কথা বলি, রুমকির আত্মকথার দ্বিতীয় পর্বটা আমরা কাল শুনব। আজ আমরা কিছুক্ষণের জন্যে হলেও একটু শুয়েনি। তা না হলে কাল সকালে খুব খারাপ লাগবে। বিরাট খাট, গড়ের মাঠের মতো। তিনজন তিন দিকে। এখন কথা হল, রুমকির যদি আপত্তি থাকে।'

রুমকি বললে, 'আমি একলা শুতে পারব না। ভয়ে হার্টফেল করব।'

সুবীর ধপাস করে শুয়ে পড়ে বললে, 'রুমকিকে তোর দিকে নিয়ে নে। গুড নাইট।'

'একটু আগে বললি, ইনসমনিয়া!'

'ভোরের দিকে আসে, তিনটে থেকে আটটা।'

সুবীর নেতিয়ে পড়ল। নাক ডাকছে ফুরুর, ফুরুর।

রুমকি আমার পাশে শুয়ে বললে, 'মনে কোনো পাপ রেখ না। শরীর আলগা কর।'

মনে পাপ রেখ না। বললেই হল। এ যে আমার কাছে ফুলশয্যার রাত। রুমকি সুন্দরী। চিনুর চেয়ে সুন্দরী। যৌবনের ঢেউ খেলছে শরীরে। সে আমি বর্ণনা করতে পারব না। একাল অনেক এগিয়ে গেছে। সেকাল হলে এমন মেয়েকে মায়েরা চোখে চোখে আগলে রাখত।

দোতলার দালানের আলোটা জ্বেলে রাখা হয়েছে। আলোর আভা জলের ধারার মতো সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে নামছে। ওপাশে সুবীর না থাকলে আমি হয়তো ভীষণ রকমের একটা অন্যায় করে জেলে যেতুম।

রুমকি বললে, 'ঘুমোলে?'

'না, আসছে না।'

'আমারও আসছে না। আমার দিকে সরে এস না।'

আমার একটা হাত টেনে নিয়ে নিজের বুকের ওপর রাখল। শ্বাস-প্রশ্বাসে তার বুক ওঠা-নামা করছে আমার হাতটাকে নিয়ে। এতটা ঘনিষ্ঠতা ভালো লাগছে না। পৃথিবীতে যে-ক'বছর এসেছি তাতে সার বুঝেছি, আপনার বলতে দুজন, মা আর বাবা, আর সবচেয়ে আপনজন—ভগবান! এসব বাজে—সব ঝুট হ্যায়।

সুবীর ঘুমিয়েছে, না মটকা মেরে পড়ে আছে! আমাদের খানিক ঘনিষ্ঠ হওয়ার সুযোগ দিয়েছে। ঘি আর আগুন পাশাপাশি। রুমকি আমার খুব কাছে সরে এল। আমার কানের কাছে মুখ। গলায় গরম গরম নিঃশ্বাস। বড়ো এলাচের গন্ধ।

রুমকি ফিসফিস করে বললে, 'দিদির মা পাগলের মতো একটা জিনিস খুঁজছে।'

'কী জিনিস?'

'কোথা থেকে শুনেছে, পারিবারিক যত গয়না শ্বশুরমশাই এই সবই কারো কাছে গচ্ছিত রেখে গেছেন। বেহালার বাক্সে ভরে। তিনি খুব বড়ো ওস্তাদ ছিলেন। বেহালাটা ওই বাড়িতে পড়ে আছে। বাক্সটা নেই।'

সুবীর আচমকা 'উঃ' বলে লাফিয়ে উঠল 'আলো জ্বাল, আলো জ্বাল।'

'কি হল রে!'

'কামড়েছে। মনে হয় কাঁকড়াবিছে।'

নিমেষে সব লণ্ডভণ্ড। বালিশ-চাদর মেঝেতে গড়াগড়ি। সুবীর বাইরে বেরিয়ে গেছে। আকাশে ভোরের আলো ফুটছে। সুবীর বাইরে থেকে ডাকছে, 'শুভ্র! একবার আয় না।'

অনেকটা দূরে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে বলল, 'কিচ্ছু কামড়ায়নি। পাছে তুই গচ্ছিত গয়নার কথা বলে ফেলিস! আমি ঘুমোইনি। মটকা মেরে পড়েছিলুম। মেয়েটাকে স্টাডি করছিলুম। সব কিছু বাজিয়ে নিতে হয়। তোকে একটা কঠিন কাজ—সুবীর থেমে গেল। রুমকি আসছে। ভীষণ উত্তেজিত। 'এই দেখ কি বেরিয়েছে।'

এত বড়ো একটা ধুতরো ফল। ভোরের আলোয় স্পষ্ট।

অবাক কাণ্ড। ধুতরো এল কোথা থেকে!

রুমকি চা বসাতে রান্নাঘরে চলে গেল।

ধুতরো ফলটা আমার হাতে। মা সারা জীবন শিবপূজা করে গেছেন। বিছানায় ধুতরো রেখেছিলেন সুরক্ষার জন্যে। রুমকি চলে যেতেই সুবীর বললে, 'তোকে লম্পট প্রেমিক হতে হবে।'

'মানে?'

'তোকে দেখতে হবে, রুমকির জঘনে ক্ষতচিহ্ন আছে কি না?'

'সে কি করে সম্ভব!'

'সম্ভব! রুমকি ভীষণভাবে তোর প্রেমে পড়েছে। ঘরে তুলতে হলে যাচাই করে নিতে হবে। কে সে! সে কোন দলের! হঠাৎ গয়নার কথা উঠল কেন?'

'কোন দলের মানে?'

'ওই ভদ্রমহিলার দলের কি না? হঠাৎ এল? কেন এল?'

'তুই মানুষকে ভীষণ সন্দেহ করিস।'

'আমাকে ব্যবসা করে খেতে হয় ভাই। আমি এখন যাচ্ছি। রাত্তিরে আসব।' ফিস ফিস করে বললে, 'চুটিয়ে প্রেম কর। জায়গাটা দেখে নে। গল্প না সত্যি।'

পাঁচ

চা, বিস্কুট খেয়ে সুবীর বেরিয়ে গেল। একবার বললে, চানটা সেরে নি, তারপর বললে, থাক সময় নেই। খুব তাড়াহুড়ো করে চলে গেল।

রুমকি বললে, 'ঘরে এস।'

খাটের ধারে আমাকে ঠেলে বসিয়ে দিল। গায়ে খুব জোর আছে। ছাত্রজীবন থেকেই আমি ব্যায়াম করি। এখনো সপ্তাহে তিন দিন জিমনাসিয়ামে যাই। তবুও মনে হল রুমকির সঙ্গে লড়াই হলে আমি হেরে যাব।

রুমকি একে একে সব জানলা বন্ধ করে, দরজায় ছিটকিনি তুলে দিল।

ব্যাপারটা কি! বেশ ভয় পেয়ে গেলুম। আমাকে খুন করবে নাকি! মনে মনে আত্মরক্ষার জন্যে প্রস্তুত আমি। আমার সামনে দাঁড়িয়ে একে একে সব পোশাক খুলে ফেলে বললে, 'নাও, দেখে নাও। যাচাই করে নাও। মাথা নীচু করে আছ কেন? যেদিকে তাকাবার তাকাও সে দিকে।'

জীবনে আমি কখনো নগ্ন নারী দেখিনি। ছবিতে না, সিনেমাতেও না। সামনে দাঁড়িয়ে সুঠাম এক দেবী। যবের মতো গায়ের রঙ। সিল্কের মতো ত্বক।

'কী হল? চোখ বুজিয়ে আছ কেন? তোমার বন্ধু যা দেখতে বলেছে দেখ। তাকাও।' আমার ভীষণ ভয় করছে। বুক টিপটিপ করছে। মেরুদণ্ডে শীতল স্রোত।

ভয়ে ভয়ে বললুম, 'তুমি কি করে শুনলে?'

'আমার কুকুরের কান।'

'তুমি সব পরে ফেল। আমার ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।'

রুমকি হেসে উঠল, 'তা কি হয়! নেপালীর ভোজালি জান?'

'না।'

'খাপ থেকে বেরলে একটু না একটু রক্ত না নিয়ে ঢোকে না। আমার এই বুক তোমার হাত দুটো চাইছে।'

কারো মাথার ওপর আকাশ ভেঙে পড়লে যেমন হয়, আমার ঠিক সেই রকম হল। সমুদ্রের ঢেউয়ের মতো রুমকি আছড়ে পড়ল আমার ওপর। কিছুক্ষণ কি হল বলতে পারব না। তাল তাল মাখনের মধ্যে আমি ডুবে যাচ্ছি। আমি যেন একটা পুডিং। ছোট্ট একটা চেরি ফল আমার ঠোঁটের সামনে। এক ঝাঁক টিয়া বাইরের আকাশে বাতাস-কাঁপানো ডাক ডাকতে ডাকতে উড়ে গেল। পরক্ষণেই সেই প্রাচীন ঘুঘুটার ঘুক্ ঘুক্ ডাক। সুন্দর একটা দেহের তলায় চাপা পড়ে আছি। চেতনা আচ্ছন্ন হয়ে আসছে। বেলাভূমিতে আঁজলা আঁজলা ঝিনুক ছড়িয়ে দিয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের ঢেউ। এখন চোখের সামনে সেই ক্ষতস্থান। কোনো এক নেশাকাতর পিতার খোদাই। তার পাশেই রহস্যময় গুহা। বীজ আকারে প্রতিটি মানব সন্তানকে দশমাসের জন্মসাধনা করতে হয়। সুরক্ষিত, শব্দহীন, আলোকহীন সেই নিভৃতি। যেখানে খাদ্য আছে, স্নেহ আছে, অদৃশ্য কোনো ভাস্কর আছে। চৈতন্য দিয়ে, সংসার দিয়ে তৈরি করছে মানবদেহ। প্রবেশে পুলকিত আনন্দ, নিষ্ক্রমণে কুঁকড়ে যাওয়া যন্ত্রণা। বিরাট জগতের ঝলসে যাওয়া আলোয় ক্রন্দনের ভূমিকায় ভূমিষ্ঠের জীবনকাব্যের শুরু। ঘড়ির টিকটিক। ষাট, সত্তর, আশি।

জানলা খুলে গেল। দরজা উন্মুক্ত। দালানের মেঝেতে খবরের কাগজ। ছুড়ে ফেলে দিয়ে গেছে রবিদা। রুমকি ঝিনুকের মতো দাঁত বের করে হাসছে। সাদা শালোয়ার, সাদা কামিজ। নরম সাদা ওড়না।

'তোমার মুক্তি নেই। অজগরে ধরেছে। তুমি এত বোকা কেন?'

'এ কথা বললে?'

'কাকে বিশ্বাস করে বসে আছ? এই তো সেই তৃতীয় ব্যক্তি!'

'কী বলছ তুমি?'

'সাচ বাত। কম্বল চাপা দিয়ে আগুন নেভাবার চেষ্টা করছি। দূর থেকে সব হই হই করে আসছে। দিদি একটা কথাই বলতে পেরেছিল—বাঁচাস। সেই মুহূর্তে মনে হয়েছিল, বাঁচাও বলতে গিয়ে বাঁচাস বলেছে; কিন্তু না পড় এইটা, তোমাকে লিখছিল, শেষ করে ডাকে দেওয়ার সময় পায়নি।'

অসমাপ্ত সেই চিঠি—'শুভ্র, সাবধানে থেকো। যেভাবেই হোক ওরা জেনেছে বেহালার বাক্সটা তোমাদের বাড়িতে আছে। আইনজ্ঞের পরামর্শ নিয়ে জেনেছে আমি মরলে বিষয়-সম্পত্তি ওই মা-নামধারিণী মহিলাটি পাবেন। তোমাকে একটা অদ্ভুত কথা শোনাতে চাই, সুবীর একজন নয় দুজন আমি হয়তো—' চিঠি আর এগোয়নি।

'এর মানে?'

'মানে এই হতে পারে, আইডেন্টিক্যাল টুইন। এক সুবীর যেমন ভালো, আর সুবীর সেই রকম খারাপ। উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু। এইবার ধরো কাল রাতের সুবীর বদলে যদি আর এক সুবীর আসে।'

'কেন আসবে?'

'বেহলা উদ্ধারে। সত্তর থেকে আশি লক্ষ টাকার গয়না। সতেরখানা হিরে, পনেরখানা রুবি। প্লাস সোনা।'

'তুমি কী করে জানলে?'

'এই যে, এই কাগজখানা।'

লম্বা একটা পার্চমেন্ট। গয়নার লিস্ট ।

'তুমি কোথায় পেলে?'

'চোরের ওপর বাটপারি। এই দ্বিতীয় সুবীর আর কাকাবাবু—এদের একটা ঘাঁটি আছে, নারকেলডাঙার বাগানে।'

'তুমি কি করে জানলে?'

'এক সেকেন্ড। আমি আসছি।'

রুমকি বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। মিনিট পনের পর একটি মেয়ে ঘরে এসে বললে 'হাই।'

চোখে সানগ্লাস, চুল অন্যরকম। জিন্‌স, টিশার্ট। রুমকি বলে চেনার উপায় নেই।

বললে, 'বসতে পারি?'

'হ্যাঁ, বসুন।'

বসেই একটা রিভলভার বের করে আমার দিকে নিশানা করে বললে, 'যা আছে বের করে দাও।'

ভয় পেয়ে গেছি। ইয়ারকি না সত্যি! দুই সুবীরের গল্প, সত্যি না গল্প!

রুমকি কি ওদের দলের!

'ভিতু, ভিতু', হেসে উঠল রুমকি, 'এটা টয় রিভলবার।'

সানগ্লাসটা চোখ থেকে সরিয়ে বললে, 'তোমাকে মানুষ করতে আমার অনেক সময় লাগবে। তোমাকে আমার বর করব, না ছেলে করব, বউ হব, না মা হব!'

ধর্মের জগতে একটা কথা আছে—সমর্পণ। রুমকির এই একটি কথায় মনে মনে নিজেকে তার কাছে সম্পূর্ণ সমর্পণ করে দিলুম—'কিন্তু, আমি যে তোমাকে চাই, এই একটু আগে যে-ভাবে পেয়েছিলুম।'

'থামো, ওটাও আমাকে শেখাতে হবে। আনাড়ি কোথাকার।'

'তুমি এই মেকআপে কি কর?'

'ফলো করি। গোয়েন্দাগিরি করি।'

'এই সাজ নিশ্চয় ওই বাড়িতে বসে করো না?'

'অবশ্যই না। এজেনসিতে বসে করি।'

'অ্যাঁ, সে আবার কী?'

'দিদি এক ডিটেকটিভ এজেনসিকে দায়িত্ব দিয়েছিলো তার মায়ের রহস্য বের করার জন্যে। চুপি চুপি আমাকে পাঠাত খবর নেওয়ার জন্যে। কর্নেল মুখার্জি একদিন আমাকে বললেন, ঘরের শত্রু হবে। পারব আমি? নিশ্চয় পারবে। একটাই কায়দা, খুব সহজ হতে হবে। চোখে-মুখে যেন কোনো উদ্বেগ, উত্তেজনা না থাকে। এই ড্রেস তাঁরই দেওয়া। নারকেলডাঙার একটা পোড়ো বাগানে এদের ঘাঁটি। কারবার হল ব্ল্যাকমেল। দিদি মেঝেতে লিখেছিল বিনাশ, ওটা হবে অবিনাশ। 'অ'টা ঠিকমতো ফোটেনি। এই অবিনাশই দ্বিতীয় সুবীর।'

'কী কাণ্ড! এখন কোন সুবীর এল বুঝব কী করে?'

'দেখ, এইরকম যদি হয় প্রথম সুবীর আর এলই না। বেমালুম উধাও করে দিল। তুমি কি জান এই বাড়ির ওপর নজরদারি আছে? ওয়াচ করছে? তোমাদের আউট হাউসে তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে যা-তা কাণ্ড করছে। দূর থেকে বেহালার শব্দ ছুঁড়ছে।'

'কেন? আমার ওপর এত রাগ কেন?'

'বেহালাটা চাই, বাড়িটাও চাই। ওই বাড়িটাকে কেন্দ্র করে এই পাড়ায় পাপ ঢুকেছে।'

'আমি এখন কী করব?'

রুমকি গম্ভীর মুখে বললে, 'বিয়ে করবে।'

'কাকে?'

'কাকে আবার, আমাকে।'

'তোমাকে করব কেন?'

'আমি তোমাকে ভালোবাসি, তাই।'

'কেন ভালোবাস? আমাকে কেউ ভালোবাসতে পারে আমি বিশ্বাস করি না।'

'যে গুণ থাকলে মেয়েরা ভালোবাসতে পারে, তোমার মধ্যে সেই সব গুণ আছে। সব মেয়েই তোমাকে ভালোবাসবে সেটাই আমার সমস্যা।'

'তোমার মতো একটা স্মার্ট মেয়েকে আমার মতো একটা ক্যাবলা কতদিন কাছে রাখতে পারবে, সেটাই আমার ভয়।'

'তুমি রাখবে কেন, আমিই তো তোমাকে আমার বুকে জড়িয়ে রাখব। আমার কত স্বপ্ন, তবে কি জান, আমাকে মেরে ফেলতে পারে। অবিনাশ যদি আমাকে বিনাশ করে!'

রুমকি একটা ঘোরের মধ্যে চলে গেল। দেহটাকে চেয়ারে এলিয়ে দিয়েছে। চোখ দুটো আধ বোজা। স্বপ্নের রিলে হচ্ছে, 'বাগানঘেরা সুন্দর একটা বাংলো। ছোট্ট একটা মটোরগাড়ি, লাল রঙের। কাঠের মেঝে। নরম কার্পেট পাতা বসার ঘর। এক দিকের জানলায় ফরেস্ট, আর দিকের জানলায় পাহাড়। সুন্দর একটা রান্নাঘর। সুন্দর একটা চানঘর। একটা ধ্যানঘর। একটা গোল্ডেন রিট্রিভার কুকুর। ভালো একটা মিউজিক সিস্টেম। আর তোমার মতো একটা তুমি। বাঁচতে বাঁচতে আমরা দুজনে বুড়ো-বুড়ি হয়ে যাব। আমাদের কোনো সন্তান থাকবে না। শীতের রোদে গোলাপ বাগানে গার্ডেন চেয়ারে দুজনে বসে থাকব। আমার হাতে বোনা সাদা পশমের সোয়েটার তোমার গায়ে। মাথায় বেরে ক্যাপ। কোনো দুশ্চিন্তা নেই, বেয়াড়া কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। বাইনোকিউলার দিয়ে পাখি দেখব। পাহাড়ের দিক থেকে বয়ে আসবে শীতল বাতাস। শীতের পাতা বড়ো বড়ো গাছ থেকে খস খস করে ঝরে ঝরে পড়বে।'

সুবীর ফিরে এল।

বেশ আড়ষ্ট হয়ে গেলুম, এ কোন সুবীর!

রুমকি বললে, 'যাচাই করে নাও।'

সুবীর একটু থতমতো খেয়ে গেল।

রুমকি বললে, 'যাচাই হয়ে গেছে, আসল সুবীর।'

জিগ্যেস করলুম, 'কী ভাবে করলে?'

'তোমাকে বেলেছিল, আমাকে যাচাই করে নিতে। এই যাচাই শব্দটা শুনে সুবীরদা কেমন যেন হয়ে গেল। অবিনাশ হলে বুঝতই না।'

'তোর যে একজন যমজ ভাই আছে কোনোদিন বলিসনি তো!'

'আমাদের পরিবারের লজ্জা। আমি ভুলতে চাই। সে এক সমস্যা। হয় সে জেলে যাবে, না হয় আমি যাব। অথবা আমাকে আত্মহত্যা করতে হবে।

তোদের দুজনকে আমার একটা আইডেন্টিফিকেশন মার্ক দেখিয়ে রাখি যেটা ওর নেই। এই দেখ আমার কপালের ডানপাশে হেয়ার লাইনের নীচে ছোট্ট একটা কাটমার্ক। ভাঙা কাচ ঢুকে গিয়েছিল। খুব সাবধান, দ্বিতীয় সুবীর যে কোনো সময় আসতে পারে, আর প্রথম সুবীর অদৃশ্য হয়ে যেতে পারে। আমাকে একজন ফোন করেছিল—বেহালার বাক্সটা কোথায়! যে কোনো দিন এই বাড়িতে হামলা হতে পারে। আমাদের প্রথম কাজ, এই মুহূর্তে বেহালার বাক্সটাকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে হবে।'

'কী ভাবে?'

'আগুন। আগুনের মতো আর কী আছে! আর সেই কাজটা এখুনি করতে হবে।'

'অত সুন্দর বাক্সটা!'

'তোর সবচেয়ে বড়ো বিপদ কি বল তো—তুই চুরি না করেও চোর।'

'গয়নাগুলো ফেরত দিয়ে দিলেই তো হয়।'

সুবীর দৃঢ় গলায় বললে, 'না, ও গয়না চিনুর। তার মানে তোর।'

'আমি তো চিনুকে বিয়ে করিনি।'

'করবি! চিনু তো তোর সামনে বসেই আছে।'

চারিদিক থেকে কীরকম একটা ভয় ঘিরে আসছে। নারকেলডাঙার যে-বন্ধ কারখানার পোড়ো বাড়ি থেকে সুবীরের যমজ অবিনাশ 'অপারেট' করছে, সেই বিখ্যাত স্বদেশী ফ্যাক্টরির ফাউন্ডার ছিলেন সুবীরের ঠাকুরদা। কোন জায়গার কী পরিণতি! পৃথিবীর সব দেশ চেষ্টা করছে এগোতে, আমরা চেষ্টা করছি পেছোতে।

সুবীর বললে, 'আমার মাথায় একটা আইডিয়া এসেছে।'

'কী আইডিয়া?'

'বেহালার কেসটা লুকিয়ে লুকিয়ে নারকেলডাঙার বাগানে ওদের ঘাঁটিতে রেখে আসব।'

'কি লাভ?'

'নিজেদের মধ্যে লাঠালাঠি শুরু হয়ে যাবে। প্রত্যেকেই প্রত্যেককে সন্দেহ করতে থাকবে।'

আমি বললুম, 'এই উদ্বেগ, এই অশান্তি এক কথায় মিটে যায়, যদি গয়নাগুলো চিনুর মাকে দিয়ে আসি। কারণ চিনুর মৃত্যুর পর সমস্ত কিছুর মালিক চিনুর মা।'

রুমকি বললে, 'অসম্ভব! এমনও তো হতে পারে গয়নাগুলো তোমার দাদুর

কাছে বাঁধা রেখে টাকা ধার নিয়েছিল? এমনও তো হতে পারে ওর মধ্যে তোমাদের গয়নাও আছে। এটা কাঁচা প্রস্তাব?'

সুবীর চান করতে গেল।

রুমকি হঠাৎ বললে, 'সুবীর একজন না দুজন?'

'মানে?'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে।'

রুমকি ফিস ফিস করে তার সন্দেহের কথা জানাচ্ছে।

'দেখ, এমনও তো হতে পারে, একটা লোক ডবল রোল প্লে করছে।'

'সন্দেহের কারণ?'

'সিনেমায় সীতা ঔর গীতা হয়, বাস্তবে দেখেছ?'

'না। তবে ভ্রান্তিবিলাস পড়েছি।'

'সন্দেহের দ্বিতীয় কারণ, আঙুলের আংটি। একেবারে একই আংটি দুজনের আঙুলে থাকতে পারে কী? তৃতীয় কারণ, বেহালার বাক্সটা বাগাতে চাইছে, কারণ ওইটা হল রশিদ। সবচেয়ে বড়ো বিপদ, তোমরা দুজনে গিয়ে লকারে গয়নাগুলো রেখে এসেছ। সুবীর কী ব্যবসা করে? সে ব্যবসা কেমন চলে? তুমি জান কিছু?'

'না।'

'একালে মানুষকে বিশ্বাস করা শুধু বোকামি নয়, বিপদেরও কারণ। আমি কে? আমাকে এতটা বিশ্বাসের কারণ? যে-মেয়ে এক কথায় অজানা এক পুরুষের সামনে সব খুলে দাঁড়াতে পারে সে কি ভালো মেয়ে? তুমি আমাকে বিশ্বাস করলে, তোমার বন্ধু আমাকে যাচাই করে নিতে বলল। কেন? তুমি সরল, সে সন্দিগ্ধ। সে ব্যবসাদার।'

সুবীর আসছে। রুমকি রান্নাঘরে চলে গেল। সুবীরের সঙ্গে আমি কোনো কথা না বলে আমি বাথরুমে স্নানে ঢুকে গেলুম। বাথরুমের মতো নিভৃত চিন্তার জায়গা দ্বিতীয় নেই। চিনু মারা গেল আগুনে পুড়ে। পোস্টমর্টেমে সন্দেহজনক কিছু নেই। এখানেই তো সব মিটে যেতে পারত! একটি মেয়ে এল। সঙ্গে নিয়ে এল একগাদা সমস্যা ও সন্দেহ। বন্ধু বিচ্ছেদের উপক্রম। এখন মনে হচ্ছে, বাড়ির কোথায় কি আছে দেখার জন্যে সুবীরের এত উৎসাহ কেন?

আমরা যখন একসঙ্গে খেতে বসলুম, সুবীরকে কেমন যেন একটু অন্যমনস্ক দেখাল। খেয়ে উঠে জামা-প্যান্ট পরে বেরোবার সময় বললে, 'আমি ব্যবসার কাজে দিন পনেরর জন্যে বাইরে যাচ্ছি শুভ্র! তুই এদিকটা ম্যানেজ কর। ভয় পাওয়ার কিছু নেই।' চলে গেল!

আমি আর রুমকি বেশ অবাক হয়ে বসে রইলুম কিছুক্ষণ।

রুমকি বললে, 'চলো, অলুক্ষণে বেহালার বাক্সটা পোড়াই। তুমি ওটাকে টুকরো টুকরো করে দাও, আমি কেরসিন ঢেলে জ্বালিয়ে দি।'

সৎকার করার আগে সেই অপূর্ব সুন্দর বাক্সটা একবার খুললুম। ভেতরে একটা ভাঁজ করা কাগজ।' 'কি আশ্চর্য! এটা আবার কী?'

রুমকি বললে, 'ছিল না?'

'না।'

'খোলো। খুলে দেখ।'

একটা চিঠি,

শুভ্র, এ আমার স্বীকারোক্তি। আমিই সুবীর, আমিই অবিনাশ। চিনুর মৃত্যুর জন্যে আমিই দায়ী। চিনুকে আমি পেতে চেয়েছিলাম। কিন্তু সে তোকে ছাড়া আর কিছু চাইত না। আমার ঈর্ষা তাকে প্রাণদণ্ড দিল। অবিনাশ নামে ওই বাড়িতে আমার প্রবল প্রতিপত্তি ছিল। ওর মায়ের সঙ্গে আমার বিশ্রী একটা সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। দোষটা আমার নয় ওই মহিলার। কাকাবাবু অসুস্থ মানুষ। বাইপাস হয়ে গেছে। লোকটার আর কিছু নেই।

মা যে মেয়ের প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠতে পারে, শুনেছি, এই প্রথম দেখলুম। যে-রাতে চিনু আমাকে জুতো মারলে, সেই রাতেই আমার প্রতিশোধ স্পৃহা প্রবল হল। একাধিক রাত আমি ওদের বাড়িতে থেকে দেখেছিলুম, সকালের চা চিনু নিজেই করে। অনেক মাথা খাটিয়ে একটু ফুলপ্রুফ প্ল্যান বের করলুম। এমন বরাত, লেগে গেল। খুব ভোরে উঠে খানিকটা মোবিল রান্নাঘরের মেঝেতে কায়দা করে ফেলে রাখলুম। সন্দেহটা যাতে তৃতীয় কারো দিকে যায়, তার জন্যে একটা হেঁয়ালি চিরকুট লিখে ওর মায়ের বালিশের ভেতর রাখলুম। আমি ত্রিসীমানায় আর থাকলুম না। মোবিলে পা স্লিপ করে ওর মায়ের হাত থেকে বাসন পড়ল, চিনু পা হড়কে গ্যাসের ফ্লেমের ওপরে পড়ে সবসুদ্ধ নিয়ে মেঝেতে। বীভৎস! রাতের ঘুম চলে গেল। আমি এখন অন্য ঘুমের কোলে চলে যাচ্ছি। তুই যদি এই স্বীকারোক্তি নিয়ে থানায় যাস, আমাকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যাবে না। তোর প্রেমিক, তোর বাড়ি, দুটোর ওপরেই আমার লোভ ছিল। ভূতের উপদ্রব আমার প্ল্যান, আউট হাউসের যত কাণ্ড আমিই করিয়েছি।

একটা শক্তিরূপিণী মেয়ে তোর জীবনে হঠাৎ এসে পড়ায় তুই জোর বাঁচা বেঁচে গেলি শুভ্র। আমার ভয়ঙ্কর, ভয়ঙ্কর সব প্ল্যান ছিল। আমি জানতুম তুই ফরেস্টে যাবি, আর তখনই ওই প্রাসাদের মতো বাড়িটা আমার দখলে এসে যাবে। চিনু কিন্তু খুব বিশ্বাসযোগ্য মেয়ে ছিল না। রাগী, অহংকারী, বিলাসী, খুঁতখুঁতে। সে আমাকে ধরে ফেললেও উচ্ছ্বসিত হয়ে বলে যাচ্ছি, রুমকি দেবী। দেবী দুর্গা। তোদের জীবনে সুখ আসুক।

আর একটা আশ্চর্য কথা বলে যাই, গয়নাগুলো সব রুমকির। রুমকির মা জমিদারের মেয়ে ছিলেন। স্বামীর অবস্থা দেখে গয়নাগুলো তোর দাদুর কাছে রেখেছিলেন। তারপর এল সেই দুর্যোগ। বোলপুরের কাছে রেললাইনে যে অজ্ঞাত পরিচয় মহিলা কাটা পড়েছিলেন, তিনি রুমকির মা।

দেখ্, কি মজার ব্যাপার, ভদ্রমহিলা কেমন না জেনেই ঠিক জায়গায় মেয়ের বিয়ের গয়না রেখে গিয়েছিলেন, পাত্রটিও তুলনাহীন ভালো। তিনি ওপর থেকে দেখে সুখী হবেন, আশীবার্দ করবেন নিশ্চয়! ভগবান আছেন, কী বলিস শুভ্র! গয়নাগুলো কিন্তু আমার আবিষ্কার। বিদায়! তোদের ঘৃণাই আমার পাথেয়। একটা হিরের আংটি বাথরুমের সোপকেসে রইল। ঘৃণ্য অপরাধীর প্রীতি উপহার।

সুবীর।

রুমকির চোখে জল। আমার ভেতরটাও কেমন যেন থমথম করছে। না, ভাবব না। কিছুই ভাবব না। ভাবনা খুব খারাপ জিনিস। আমার মা বলতেন—সমর্পণ। ঠাকুরের কাছে নিজেকে সমপর্ণ করে দে।

হঠাৎ রুমকি তেড়েফুঁড়ে উঠল, 'আজ পূর্ণিমা। আজই আমরা বিয়ে করব।'

'সে কি, পুরোহিত পাব কোথায়?'

'নিজেদের বিয়ে আমরা নিজেরাই করব। তুমি অনেক ফুল আর মালা কিনে আন। মায়ের ছবির সামনে। চাঁদ সাক্ষী।'

বিছানায় থই থই চাঁদের আলো। সাদা সাদা ফুল, মালা, সুরভি। রুমকির সুন্দর কপালে সোনার টিপ। তার ওপর চাঁদের আলো। রুদ্ধ গলায় বললে, 'যেদিন তোমার কাছে এলুম, সেদিন সুবীরদা ওই ওইপাশটায় শুয়েছিল।' সেই বেহালা আজ আবার বাজছে। কে!! কে বাজায়!